নিগ্রো-স্বাধীনতার জন্মদাতা

আব্রাহাম্ লিঙ্কল্ন্

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

রামকৃষ্ণ পাবলিশিং ওয়ার্কস্
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রোপ্রাইটার রামকৃষ্ণ পাবলিশিং ওয়ার্কস্
১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
সিটি লাইব্রেরী
বাঙ্গলা বাজার, ঢাকা।

দাম দেড় টাকা

কান্তিক প্রেস
৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

বৎসর সাত আট হইল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম বীরপুরুষ লিওনিদাস্ সম্বন্ধে একখানা ছোট বই লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় গ্রীক-পারশিক লড়াই বিষয়ক। বইটা পড়িয়াই বলিয়াছিলাম,—"রচনায় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইতেছি। লিখিবার ভঙ্গীতে জীবন ব্যাখ্যা করিবার ওস্তাদি ধরিতে পারা যায়। এই কৌশলের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে অনেক হইলে আনন্দের কথা হইবে। বিদেশী লোকজন ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে মাথা খেলাইবার দৃষ্টান্ত হিসাবেও এই পুস্তিকা সবিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"

তাহার পর বিনোদবিহারী বাংলা সাহিত্যে দেখা দেন "রেগুলাস" নামক গ্রন্থের প্রণেতা রূপে। রেগুলাস ছিলেন কার্থেজের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইয়ের সময়কার রোমাণ কন্সাল ও সেনাপতি। সে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝির কথা। এই বইয়েও লেখক খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য ও জীবনবৃত্তান্তের ভিত্তির উপর বীরবরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একদিকে দেখিতেছি কার্থেজের নরনারীর ধরণ-ধারণ, অপর দিকে প্রকাশ পাইতেছে রোমাণ স্বদেশসেবকের চিত্তবৃত্তি। কোনো নাট্যকারের হাতেও রেগুলাসের কর্ম্ম ও চিন্তা আরও বেশী উজ্জ্বলরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হইত না। জীবনী পড়িতে পড়িতে পাঠকেরা গ্রন্থকারকে অপূর্ব্ব উপন্যাসের লেখকরূপে সম্বর্দ্ধনা করিতে বাধ্য হইবেন।

এইবার প্রকাশিত হইতে চলিল বর্ত্তমান যুগের অন্যতম বীরের কাহিনী। কাল ঊনবিংশ শতাব্দী। স্থান আমেরিকা। পাত্র আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্। এই বইয়ে গ্রন্থকার নতুন এক কায়দা দেখাইয়াছেন। লিঙ্কল্‌ন্ নিজেই যেন নিজের জীবন বিবৃত করিয়া যাইতেছেন ইহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের রচনা-কৌশল। বলা বাহুল্য এই লিখন-রীতি সোজা নয়। একজন বিদেশী বীরপুরুষকে তাঁহার নিজের মুখে আত্মকাহিনী প্রচার করানো অতি উঁচুদরের সাহিত্য-সাধনায়ই সম্ভবপর হয়। ঠিক যেন কাল্পনিক কথোপকথন লেখা! তাহাতে শিল্পনৈপুণ্যে দখল দরকার হয় প্রচুর। এই সকল তরফ হইতে বিনোদবিহারীর "আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্" বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ। অধিকন্তু জীবনী-রচনায় গ্রন্থকার যে তথ্যানুরাগ, বস্তু-নিষ্ঠা, চিত্ত-বিশ্লেষণ, এবং সহজ-সরল প্রকাশ-রীতি দেখাইলেন তাহা বহু শিল্পনিপুণ সাহিত্য-সাধকের চিন্তায়ই অমূল্য বিবেচিত হইবার কথা।

ঠিক এই প্রণালীতেই বিনোদবিহারী আর একখানা বই লিখিয়াছেন। তাহাও মার্কিণ বীরের জীবনী। এই বীরের নাম গারফীল্ড। গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

বিনোদবিহারী দেখিতে দেখিতে চার চারখানা জীবনচরিত লিখিলেন। প্রত্যেক চরিত-কথায়ই আমরা শক্তিযোগী কর্ম্মবীর, মানুষের মতন মানুষ পাইতেছি। এই ধরণের মানুষ গড়িবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল বিবেকানন্দের প্রার্থনায়। লেখক মানুষগুলাকে জ্যান্ত রক্তমাংসের জীবরূপেই আমাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে জোর আসিল। বাঙালীর চিন্তাকে কর্ম্মনিষ্ঠায় আর কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভরপূর করিয়া তোলাও গ্রন্থকারের অন্যতম কৃতিত্ব রহিয়া গেল।

বাঙলা দেশে আজ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্য স্মৃতিপরিষৎ কায়েম

হইতেছে। বাঙালী জাতির সঙ্গে ইয়াঙ্কি নরনারীর নিবিড়তম লেন-দেন স্থরু হইবার স্থযোগ দেখা যাইতেছে। এই আবহাওয়ায় বিনোদ-বিহারীর "আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্‌" আর "গারফীল্ড" বেশ সময়োপযোগী সাহিত্য সন্দেহ নাই।

কোথায় গ্রীক ইতিহাস, কোথায় রোমাণ কাহিনী আর কোথায় মার্কিণ কথা! এই তিন যুগের তিন বিভিন্ন জগতের নরনারী সম্বন্ধে যুবক বাঙলার সাহিত্যসেবী "জলের মতন" অনায়াসে লিখিয়া যাইতে পারে! এই দৃশ্য বাঙালীর ইতিহাসে অতি মহত্ত্বপূর্ণ। আর এই লেখাও কেমন? ঠিক যেন লেখক তাঁহার নিজ বন্ধুরই স্থপরিচিত জীবনের অলি গলি খুলিয়া ধরিয়াছেন। বুঝিতেছি, যুবক বাঙলার চিন্তাশীল মহলে বিশ্বশক্তির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কায়েম হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের উপর বিনোদবিহারীর দাগ মুছিয়া যাইবে না।

কলিকাতা
৩রা ফেব্রুয়ারী,
১৯৩২

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নিবেদন

১৯১৪ সালের পূর্ব্বে লিঙ্কল্‌ন্‌ সম্বন্ধে খুব অল্পই আমার জানা ছিল। "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করি। তারপর বৎসর কয়েক হইল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটা লেখা পড়িয়া, লিঙ্কল্‌ন্‌কে ভালোভাবে জানিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। অতঃপর, যে সব উপায়ে লিঙ্কল্‌ন্‌কে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার ভিতর প্রসিদ্ধ জীবনী লেখক ডব্লিউ, এম, থেয়ার-রচিত লিঙ্কল্‌নের জীবনীই ছিল আমার প্রধান অবলম্বন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী।

এত বড় মহৎ চরিত্রকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিবার লোভটা দমন করিতে না পারিয়া কতটা অন্যায় করিলাম, জানি না। তবে, জীবনী-লেখার দিক দিয়া ভবিষ্যতের কৃতী লেখকদের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখা গেল, এই যা ভরসা।

এই গ্রন্থ-রচনায় যাহাদের নিকট প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থকার



আব্রাহাম্ লিঙ্কল্‌ন্

জন্ম—১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮০৯ মৃত্যু— ১৪ই এপ্রেল ১৮৬৫

"সেনাপতি, শিশুরা যখন আধ-আধ কথা বলিতে শিখিবে, তখন জননীরা তাহাদিগকে তোমারি নাম শিখাইবে। আমাদের দেশের যুবকরা তোমারি পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিবে। রাজনীতিকরা তোমারি রাজনীতি আলোচনা করিয়া জ্ঞানলাভ করিবেন। আজ তোমার ওষ্ঠ দুইটী নির্ব্বাক হইয়াছে দেখিতেছি,তথাপি তাহারা এখনো যেন নীরবে নীরবে কি বলিতেছে। তোমার সে উদাত্ত কণ্ঠস্বর আজ আর স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত করে না সত্য, কিন্তু সেই পুরাতনের প্রতিধ্বনিই বিশ্বময়—পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে, সাগর হইতে সাগরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, গগনে-পবনে, গ্রহে-গ্রহে, নক্ষত্রে-নক্ষত্রে—সর্ব্বত্রই শোনা যাইতেছে। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-কামী যুবক সন্তানেরা চিরদিন তোমারি বাণী শুনিয়া আশায় এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। সেনাপতি, তোমার এই দেহ মৃত্যুর কবলিত হইলেও, তোমার সাধনার পুণ্যপরশে পরাধীনের হাতের কড়া এবং পায়ের শিকল ছিঁড়িয়া যাইবে।"

বিশপ সিম্পসন

আব্রাহাম্ লিঙ্কলন্

দরিদ্র জনক-জননীর সন্তানরূপে, নিতান্ত অবনত এবং দরিদ্র সমাজের ভিতর আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। যে ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করি, উহা দরজা-জানালা-বিহীন স্যাঁতসেতে একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল। আমার জন্মস্থানটী যতদূর সম্ভব অনুর্ব্বর, এবং অনুর্ব্বরতার জন্যই জনমানবহীন ছিল। আমার পিতা দারিদ্র্যের জন্যই এই স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন্‌টাকী জিলার এক পল্লীতে ১৮০৯ সালে আমার জন্ম হয়।

আমার পিতামহের কিঞ্চিৎ জমিজমা ছিল। তাহার দ্বারা উন্নতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পুরুষানুক্রমে কোনো রকমে দু'বেলার দু'মুঠা খোরাক জুটিতেছিল মাত্র। এই দুর্ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য আমার পিতা একবার বাড়ীর বাহিরে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আমার পিতা লিখিতে কিংবা পড়িতে জানিতেন না। আমার মা কোনো রকমে পড়িতে পারিতেন। ভালো রকমে চিঠিপত্র লিখিতে পারিতেন না। বড় জোর দলীল দস্তাবেজে নামটা সহি করিতে পারিতেন। আমার পিতা টিপসহি দিয়া কাজ সারিতেন। শুনিয়াছি, আমার মা লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমার পিতাকে যথেষ্ট তাড়না করিতেন। জ্ঞানলাভের পক্ষে বয়সটা যে বড় কথা নয়, আমার মা নাকি পিতাকে একথা বহুবার বলিয়াছিলেন। মা-ও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, আর আমার পিতাও ছিলেন নিতান্ত ভালো মানুষ। শিখাইবার দিক দিয়া মা-র যতটা প্রবল আগ্রহ ছিল, না-শিখিবার দিক দিয়া পিতার ততটা জোর ছিল না। অগত্যা মা-র প্রস্তাবে রাজি হইয়া আমার পিতা তাঁহার নিকট দিনের পর দিন হাতের লেখাটা মক্‌শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার এইখানেই আরম্ভ এবং এইখানেই শেষ। যাহা হোক, কিছুকাল পরে আমার পিতাকে আর ঢেঁড়া দিয়া নিজের সহিটা করিতে হয় নাই।

আমার মা ছিলেন গোঁড়া ধার্ম্মিক, আর তাঁহার মনের জোরও ছিল যথেষ্ট প্রবল। তাঁহার সাহস এবং নিখুঁৎ বুদ্ধির কথা অনেকের নিকট শুনিয়াছি। আমার ছোট বেলায়, মা থাকিতেন ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত, পিতার ছিল চাষবাস; আর আমি, কখনো নদীর জলের উপর গাছের যে ডালটা ঝুলিত, দুই তিন হাত দূর হইতে উহা লাফাইয়া ধরিয়া ঝুলিতে থাকিতাম: কখনো বা জলে ডুব পাড়িয়া পাড়িয়া আমার দিনগুলির সদ্ব্যবহার

করিতেছিলাম। মনে আছে, তখন আমার বয়স বৎসর চারেক, একদিন ঐভাবে ডাল ধরিতে না পারিয়া, গভীর জলে পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতেছিলাম।

এইভাবে মনের আনন্দে আমি বেশি দিন কাটাইতে পারি নাই। একদিন আমার পিতা, বাড়ী আসিয়া নিকটে একটী নূতন ইস্কুলের খবর দিলেন। সেইদিন ইস্কুলের নামে মা-র যে আনন্দ দেখিয়াছিলাম, তাহা আজিও আমার মনে আছে।

সেদিনে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াই শিক্ষকেরা অর্থের সন্ধানে বাহির হইতেন। নিজেদের যাহা কিছু বিদ্যা ছাত্রদিগকে দান করিয়া করিয়া যখন দেখিতেন, তাঁহাদের দেউলিয়া হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, তখন তাঁহারা সরিয়া পড়িতেন। আমার পিতা বলিলেন, বেশি কিছু এখানে শিখিবার সুবিধা হইবে না। মা বলিলেন, তা হোক্, বিদ্যা যেখানে যা পাওয়া যায় তাই ভালো।

আমি ও আমার দিদি ব্যতীত পিতামাতার আর কোনো সন্তান ছিল না। আমার দিদির নাম ছিল "সারা"। পিতা-মাতা আদর করিয়া আমাকে ডাকিতেন "আবে"। আজিও অনেক বুড়াবুড়ী আমাকে ঐ নামে চিনেন। আমরা দুই ভাই-বোন নবীন শিক্ষকের নূতন পাঠশালায় প্রবেশ করিলাম। প্রথম দিনেই বুঝিলাম, শিক্ষক মহাশয়ের মেজাজটা কিছু কড়া রকমের। সোজা কথায়, কিছুকাল পরে বড় হইয়া আমরা যাকে বলিতাম গোঁয়ারতুমি, সেইটীই ছিল তাঁহার শিক্ষকতার পক্ষে বড় গুণ।

পরে বুঝিয়াছিলাম, অল্পবিদ্যার সম্বল লইয়া ইঁহারা এত বড় গুরুতর কর্ম্মে হাত দিতেন বলিয়াই, বাধ্য হইয়া এতটা ভয়ঙ্কর হইতেন। যাহা হোক, মাত্র পাঁচ ছয় সপ্তাহ আমরা এই পাঠশালায় যাতায়াত করিয়া বানান-শিক্ষাটা শেষ করিয়াছিলাম।

সেদিনের আমেরিকান গৃহস্থরা ছিলেন অনেকটা যাযা-বরদের মতো। আমাদের—পড়ুয়া ছেলে-ছোক্‌রাদের—অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। পূর্ব্বতন পাঠশালার পর আবার এক নূতন পাঠ-শালায় প্রবেশ করিলাম। এবারে কিছু দূরে যাইতে হইল। আমার পিতা তবু এক-আধবার "ছেলেমানুষ", "দূর" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মা সে সবের ধার ধারিতেন না। লেখাপড়া শিখিবার দরকার যখন আছে, তখন যেভাবেই হউক তাহা শিখিতেই হইবে। নিজেদের যা নাই অপরের নিকট তা আনিতে গেলে, জানিতে হইলে কষ্ট করিতেই হয়; তারপর এ আবার বিদ্যা। সকলের ঘরে, সকলের ভিতরে যদি এ বস্তু থাকিতই তবে সংসারে ইহার এত আদর থাকিত না। যে জিনিষ যত বড়, যত আদরের, তাকে পাওয়ার জন্য কষ্টও করিতে হয় ততখানি। তবে তাহার জন্য দরদ জন্মে। সহজে পাওয়া গেলে লোকে ইহাকে এত সম্মান করিত না। বিদ্যার গৌরব সম্বন্ধে এইরূপ ছিল মা-র ধারণা। যা' হোক, মা-র হুকুমে খেলাধূলা ছাড়িয়া, নির্জ্জন জঙ্গলা দেশের দূর রাস্তা ধরিয়া বিদ্যা-শিক্ষার জন্য, আবার আমরা দুই ভাইবোন নূতন গুরুগৃহের উদ্দেশে রওনা হইলাম।

একটী 'লগ' কেবিনে পাঠশালা বসিত। এই অঞ্চলে উহাই ছিল "সবে ধন নীলমণি"। আমরা প্রত্যহ আমাদের দুপুরের খাবার, কখনো হাতে করিয়া কখনো পিঠে ফেলিয়া, সঙ্গে লইয়া যাইতাম। মাস দুই আড়াই আমরা এখানে ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছিলাম। এ সকল পাঠশালায় হস্তাক্ষর সুন্দর করা একটী শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। কাজেই, আমরাও হাতের লেখা সুন্দর করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়া গেলাম। মনে পড়ে, মাটীর উপর বসিয়া খাগের কলম দিয়া এক রকম পাতার উপর প্রথম হাতে লেখা সুরু করিয়াছিলাম। একটা অক্ষর লিখিয়া একবার ডানদিক হইতে আবার বাম দিক হইতে ঘাড়টা বাঁকাইয়া আমরা হরপগুলি দেখিতাম—চেহারাটা ঠিক ঠিক হইয়াছে কি না। সেদিনে হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়াটা সাধারণে খ্যাতি লাভের পক্ষে যেমন একটা মস্ত সুযোগ ছিল, পয়সার দিক হইতেও তেমনি লাভের ছিল। সাধারণ লোকেরা ইহাকেই একমাত্র বিদ্যা মনে করিত। ইহার কারণটা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। গোলাম-মনিবদের আফিসে কেরাণীগিরির পক্ষে একমাত্র ইহারই যথেষ্ট দর ছিল। এই একমাত্র বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লেখার পদ্ধতিটাও শিখিয়া ফেলিলাম। মোটের উপর, এখানে তবু কিছু শিখিয়াছিলাম, বলিতে পারি। এই শিক্ষক মহাশয় আমাকে মানুষ হওয়ার সম্বল কিছু দিতে না পারিলেও, আমার উন্নতিশীল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আভাস

দিয়া, আমার পিতামাতাকে অনেকখানিই খুসী করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সাদা-চামড়াওয়ালা ধনীরা আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে কিনিয়া আনিয়া নিজেদের ব্যবসায়ে লাগাইতেন। মনিবদের হাসিকান্না, সুখদুঃখই ছিল, ইহাদের হাসিকান্না এবং সুখদুঃখ। তথাপি এই সব কেনা-গোলামদের উপর তাহাদের মনিবরা অকথ্য অত্যাচার করিত। কেন্‌টাকীর গোলাম-মনিবদের এই রকম অত্যাচারের কথা, আমাদের গরীব শ্বেতাঙ্গ মহলে প্রায়ই আলোচনা চলিত। ঐ সব অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রাণে যথেষ্ট বেদনা পাইতেন। এজন্য দুই চারিবার তাঁহাদিগকে ভগবানকে ডাকিতেও শুনিয়াছি। প্রতিকার করিবার সামান্য ক্ষমতাও তাঁহাদের ভিতরে কিংবা বাহিরে না থাকায়, চোখকান থাকা না-থাকা সমানই দাঁড়াইয়াছিল। এইভাবে যখন দিন কাটিতেছিল তখন, ইণ্ডিয়ানা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে রাষ্ট্রীয় ইউনিয়নের ভিতর প্রবেশের জন্য, কংগ্রেসের নিকট অনুমতি চাহিয়া দেশময় এক বিরাট আন্দোলন জুড়িয়া দেয়। যথা সময়ে এই আন্দোলনের ঢেউ কেন্‌টাকীর গোলামখানার ধারে আসিয়া প্রচণ্ড আঘাত করিল। বিভিন্ন স্থানের দাস-মনিবরা এজন্য বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, কেন্‌টাকীর মালিকরাও তাহাদের ব্যবসাদার জাতভাইদের সঙ্গে যথা সময়ে যোগ দিয়াছিল। পাছে, গোলামরা পলাইয়া গিয়া স্বাধীন ইণ্ডিয়ানায় আত্মরক্ষার

সুযোগ পায়, ইহাই ছিল ইহাদের প্রতিবাদের কারণ। কিন্তু কেন্‌টাকীর গরীব শ্বেতাঙ্গরা ইণ্ডিয়ানার স্বাধীনতা কামনা করিতেন। আমার জন্মের সাত বৎসর পরে—১৮১৬ সালে —সমুদয় গোলাম-মনিবগণের বিরাট পরিবারকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিয়া, ইণ্ডিয়ানা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

আমার পিতা ছিলেন স্বাধীনতার একজন বড় ভক্ত। ইণ্ডিয়ানার স্বাধীনতালাভে তিনিই সকলের চেয়ে বেশি খুসী হইলেন। গোলামী-প্রধান কেন্‌টাকীর অনুর্ব্বর ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ইণ্ডিয়ানার স্বাধীন মাটিতে বাস করিয়া, বিত্তশালী হইবার ইচ্ছা তাঁহার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার স্বাধীন মন, স্বাধীন চিন্তা লইয়া ইণ্ডিয়ানার মাটিতে গিয়া হাজির হইল বটে, কিন্তু আমার মা, এবং আমরা তুই ভাইবোনই হইয়াছিলাম তাঁহার ঐ মুক্তিপথের অকাটা এবং অচ্ছেদ্য বন্ধন। যাহা হোক, এখন আমাদের যাওয়ার যা কিছু বিলম্ব, তা কেন্‌টাকীর সামান্য সম্পত্তি ঐ কয়েক বিঘা জমি বিক্রয়ের জন্য। ইতিমধ্যে এক খরিদ্দার জুটিয়া গেল। এখন কথা কাটাকাটি চলিল জমির দাম লইয়া।

আমার পিতা ছিলেন দরিদ্র, আর জমির খরিদ্দারটী ছিল ধনী। আমাদের জমি বিক্রীর গরজ বুঝিয়া এবং আমাদের আর্থিক তুরবস্থার কথা জানিয়া, সে বেশ হুশিয়ার হইয়া কথাবার্ত্তা চালাইল। আমার পিতা চাহিলেন নগদ টাকা, আর সে দিতে চাহিল তাঁহাকে পিঁপাভরা মদ। "অভাগা যে

দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।” এই মদের একটা ভালো বাজার যে ইণ্ডিয়ানায় পাওয়া যাইবে, ইণ্ডিয়ানার লোকেরা যে এখনো এই বস্তুর তৈরীতে পাকাপোক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, এমন অনেক কিছুই সে বলিয়া গেল। এমন কি, লইয়া যাওয়ার অসুবিধা জানাইলেও সে এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়া বসিল। লোকটী ব্যবসাদার ছিল বটে! যাহা হোক, শেষ পর্য্যন্ত সুখের বিষয় এই হইয়াছিল যে, উভয়েই প্রীতির সহিত যার যার স্বার্থ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। আমার পিতা লইলেন জমির বদলে মদ, আর খরিদ্দার পাইল মদের বদলে জমি-জায়গা। মদের পরিমাণও তেমন বেশি ছিলনা। তথাপি এই ব্যাপারে আমার পিতার কোনোদিক্ দিয়াই অসম্মত হইবার জো ছিল না। দরিদ্রকে দুনিয়ায় এই ভাবেই রফা করিয়া চলিতে হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াই বুঝিয়াছিলাম, সংসারে দুরবস্থায় পড়ে নাই বা পড়ে না, এমন লোক বোধ হয় নাই। কিন্তু যাহারা সেই দুরবস্থার নিকট চিরদিনের কেনা-গোলাম তাহারা ঐ হতভাগ্য দরিদ্র ব্যতীত আর কেহই নহে। তাহাদের দুঃখের দিনগুলিতে সূর্য্য উঠে, হাসিকান্নার বোধ তাহাদের আছে, লোকের মুখও তাহারা দেখে। কিন্তু তাহাদের ভিতরে যে অমারাত্রির ভীষণ ঝড় হুহু করিয়া কত রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া যাইতেছে, তাহা কেহ দেখে না, জানে না, খোঁজও লয় না। দরিদ্রের হৃদয়, অবসাদে নিরাশায় স্তরে স্তরে ধষিয়া যাইতে থাকে বলিয়াই, সুখের আশা সে একটা বাতুলতা বলিয়া মনে করে।

সে জানে, সুখতো তাহার জন্য নয়! যাহারা সুখের জন্য সংসারে আসিয়াছে, তাহারা জন্ম হইতেই তাহা ভোগ করিতে থাকে। কোনো আশা, কোনো সুখ, মনে করিতেও সে ইতস্তত করে। পাছে, মুখ ফুটিয়া কোনো কথা বাহির হইলে, বিদ্রোহী বলিয়া তাহার ভগবানের নিকট চিহ্নিত হয়! ইহাই তাহার বড় ভয়। বাঁচিবার শক্তি যেমন তাহার থাকে না, মরিবার সাহসও সে তেমনি হারায়।

মা অনেকদিন বলিয়াছেন ইণ্ডিয়ানায় গেলে আর কিছু না হোক, তার ছেলেমেয়ের লেখাপড়াটা হইত। আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া শুনিয়া আমার মাতাপিতা না জানি কত স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন! আমার মা, আমার জীবনে উন্নতি দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমার দিদির ও আমার, জঙ্গলা দেশের আর একটা নূতন জঙ্গল দেখিবার জন্য, মোটেই আনন্দ হয় নাই। স্বাধীনতার মহিমা আমার পিতার মুখে অনেক দিনই শুনিয়াছিলাম। স্বাধীনতার নামে নিগ্রো শিশু যে আনন্দ আজ উপভোগ করিতেছে, সেদিনে স্বাধীনতার নামে আমি ততখানি পাগল হইতে পারি নাই। কারণ পরাধীনতার কোনো বন্ধন আমার ছিল না।

আমাদের যাত্রার দিন ঠিক হইয়া গেল। আমার পিতা চলনসই গোছের একখানা নৌকা তৈরী করিয়াছিলেন। তাহাতে নানা রকমের দ্রব্য—দা-কুড়ুল, হাতুড়ি-বাঁটালি,

হাঁড়ি-সরা, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙ্গা মাত্নরতো উঠিলই ; সব চেয়ে যত্নের সহিত উঠানো হইল ঐ মদের পিঁপাগুলি। কারণ, ইণ্ডিয়ানায় আমাদের দৌলতের পরিচয় দিবার পক্ষে ঐ মদের পিঁপাগুলিই ছিল, একমাত্র এবং মূল্যবান্ সম্পত্তি। পিঁপাগুলি সাজানো হইলে, আমার মা এবং আমরা তুই ভাইবোন নৌকায় উঠিলাম। আমার পিতা নৌকা ভাসাইয়া দিলেন। ওহায়ো নদীর উপর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। কোথায় যাইতেছি, কবে পৌঁছিব, তার কোনো ঠিকানা নাই। যেদিকে চাই, কেবল বড় বড় জঙ্গলের বিরাট সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। চল্‌তি পথে হঠাৎ এক ভীষণ ঝড় উঠিয়া, আমাদের নৌকাখানাকে কাৎ করিয়া মদের পিঁপাগুলিকে জলসই করিয়া দিয়া গেল। নৌকা সোজা রাখিবার জন্য আমার পিতা যে চেষ্টা করিলেন, তাহাতে অন্যান্য দ্রব্য যাহা ছিল, তাহাও ওহায়োর গর্ভে গেল। নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া আমার পিতাও জলে পড়িয়া গেলেন।

মদই ছিল আমাদের একমাত্র সম্পত্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিন জলে-মদে এক হইয়া গেলে আমি মোটেই তুঃখিত হই নাই ; বরং যথেষ্ট আনন্দিতই হইয়াছিলাম। এই মদের সর্ব্বনাশী ক্ষমতার কথা আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছিলাম। কত মানুষের, কত পরিবারের, যে পরিমাণে ইহা সর্ব্বনাশ করে, তাহার তুলনায় আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কোনো রকমেই বেশি হয় নাই। পেটের জ্বালা, স্ত্রী-পুত্রের

ভাবনার জ্বালা অতি ভীষণ। সেই জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মানুষে না করিতে পারে এমন কাজ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের অন্নসংস্থানের জন্য অপরের সর্ব্বনাশ আমি কখনো সমর্থন করিনা। আত্মহত্যা খুবই অন্যায়, নরহত্যাও উহার তুলনায় কম নয়, কিন্তু মদ্যপায়ী এবং মদ্যবিক্রেতা উভয়েই আমার বিচারে ভীষণ অপরাধে অপরাধী। আমার পিতার মদ লইয়া যাওয়ার ব্যাপার হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, জল কিংবা দুগ্ধ পান করার চেয়ে মদের প্রচলন তখন আমেরিকার পল্লীসমাজে কতটা প্রবল ছিল।

আমাদের নৌকাডুবির সময় স্থানীয় কয়েকজন লোক নদীর ধারে কাজ করিতেছিল। তাহারা আমাদের এই দুর্গতি দেখিয়া, জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমাদের মালপত্র কতক কতক উদ্ধার করিল। অনেক কিছুই সেদিন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু মদের তিনটী পিঁপা তাহাদের যত্নে আবার নৌকায় উঠিয়াছিল। লোকদের সহৃদয়তা দেখিয়া আমি উহাদিগকে উঁচুদরের লোক ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেদিনে এই ওহায়ো খালে কতযাত্রী, কত নৌকা যে, ইহাদের সাহায্যে আবার কূল পাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

পথে আর কোনো বিপদ ঘটে নাই। আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া, মালপত্র সমেত রওনা হইলাম। সম্মুখে ভীষণ জঙ্গল। কোনো পথ নাই। আঠারো মাইল জঙ্গল কাটিয়া আমার পিতা অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন, ইহার চেয়ে কোনো কঠোরতর অবস্থার সঙ্গে নাকি জীবনে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমাদের পথে পথে দুই চারি ঘর লোক দেখিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা খুব খুসী হইলেন। সম্পদ-বিপদের বন্ধন যদি মানুষের না থাকিত, তাহা হইলে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিবার ইচ্ছা মানুষের এতটা প্রবল হইত না। আমরা একজনের অতিথি হইলাম। ঘরগুলিতে তাহাদেরই থাকিবার জায়গা হয় না, তার উপর আমরাও দিন কতক বেশ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিলাম। লোকে বলে, "যদি থাকে এক মন, তেঁতুল পাতায় ছয় জন।"

আমরা আমাদের কেন্‌টাকীর বাড়ী হইতে এ পর্য্যন্ত একশত পঁচিশ মাইল পাড়ি দিয়াছি। এবারে গাড়োয়ান রওনা হইল। আমাদের ঐ নৌকার প্রয়োজন আর ছিল না। গাড়োয়ানও অনেক দিন হইতে একখানা নৌকার প্রয়োজন বোধ করিতেছিল। শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের মত ভাড়াটিয়া মিলিয়া যাওয়ায় তাহার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া গেল। আমাদের মাল-বহার পরিবর্ত্তে আমার পিতা তাহাকে নৌকা-খানি দিয়াই রেহাই পাইলেন। দেওয়া-নেওয়ার কোনো ব্যাপারেই এ পর্য্যন্ত কাঁচা পয়সার মুখ দেখি নাই।

এবারে আমরা আরো দূরে এক অজানা দেশের উদ্দেশে রওনা হইলাম। লোক নাই অথচ জায়গা বিস্তর। আমাদের জন্য দুইটী ঘোড়া আনা হইল। একটির পিঠে আমার দিদি,

মা ও আমি চড়িলাম। যাইবার সময় গৃহস্থরা যথেষ্ট সহৃদয়তা দেখাইলেন। থাকার দিক্‌ দিয়া তাহাদিগকে কতখানি কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করার শক্তি আমার ছিল। তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা রওনা হইলাম। আমরা কখনো পায়ে হাঁটিয়া, কখনো ঘোড়ায় চড়িয়া অজানা দেশের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে লাগিলাম। এই ভাবে চলিয়া সাতদিন পরে আমরা কূল পাইলাম। চলার পথে রাত্রিকালে দিগন্তব্যাপী জমাট অন্ধকারের ভিতর, আকাশভরা নক্ষত্রগুলিই ছিল আমাদের একমাত্র সহায়। চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইলে মাটির উপর কম্বল পাতিয়া বেশ আরামে ঘুমাইতাম।

কি পুরুষ, কি নারী, কি ছেলে, কি বুড়া সকলেরই কষ্ট সহিবার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। নানা রকম অবস্থার ভিতর পড়িয়া ছোট বেলা হইতেই বাধ্য হইয়া আমরা "ডানপিটে" হইতাম। অনাহার অনিদ্রা আমাদের অঙ্গের ভূষণ ছিল। ভয় বলিয়া কোনো বস্তু আমরা জানিতাম না। সেদিনের নারীরা যে অতুলনীয় নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকল দেশের নারীদের জানা উচিত। নারীরা ভীরু, এইকথা যে আমাদের সভ্য সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, সে খুব বেশি দিন হয় নাই। পুরুষ নারীকে সাহসী দেখিতে ইচ্ছা করিলে, নারীর চরিত্রে ভীরুতাই আজ প্রধান ক্রটী বলিয়া ধরা দিত না। কি কঠোর জীবন সংগ্রামে, কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কোনো-দিনই নারীরা পুরুষের পেছনে পড়িয়া থাকেন নাই।

নির্ভীক মানুষ, চরিত্রবান মানুষ যে, আজ এতটা নামিয়া গিয়াছে, এজন্য তাহাকে কতকটা চেষ্টা করিতে হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় অন্যায় বলা হইবে না। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এইখানে প্রাচীন নারীদের দুই একটা ঘটনা বর্ত্তমান নারীদের মঙ্গলের জন্যই শুনাইব।

আমার পিতামহ তখন কেন্‌টাকীতে গৃহস্থালী আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় একদিন আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে একটী রেড্ ইণ্ডিয়ান প্রবেশ করে। লুঠ-তরাজ করিয়া ধন তো সে লইবেই এমন কি, বাড়ীর লোকজনদিগকেও বাঁধিয়া লইয়া যাইবে ইহাই ছিল তাহার মতলব। সে একেবারে ঘরের ভিতর হাজির। বাড়ীতে পুরুষ তখন কেহই ছিল না। কাজেই গৃহিণী সন্তানদের লইয়া একেবারে নিরুপায় হইলেন। "বিপদি ধৈর্য্যম"। স্থিরবুদ্ধিই বিপদ কালের সমুচিত বল জানিয়া, তিনি রেড্ ইণ্ডিয়ানকে মদ্যপানের জন্য অনুরোধ করিলেন। গৃহিণীর এই ব্যবহারে খুসী হইয়া ইণ্ডিয়ানটী বোতল হইতে মদ ঢালিবার জন্য বন্দুকটী মাটিতে রাখিল। মদ ঢালিবার অবসরটুকুর ভিতরে গৃহিণী বন্দুকটী তুলিয়া লইয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিলেন; এবং আত্মসমর্পণ না করিলে মাথার খুলি ভাঙিয়া মগজ বাহির করিয়া ফেলিবেন বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন। ইণ্ডিয়ানটী অগত্যা ভালো মানুষ সাজিল, এবং যদি তাহাকে গুলীকরা না হয় তাহা হইলে সে তাহার কোনো ক্ষতি করিবে না বলিয়া, একখানি টুলের উপর

বসিয়া পড়িল। তাহার স্বামীর ফিরিয়া না-আসা পর্য্যন্ত এইভাবে বন্দুক ধরিয়া গৃহিণী রেড্‌ ইণ্ডিয়ানটীকে সংযত রাখিয়াছিলেন।

এক রাত্রিতে জন কতক ইণ্ডিয়ান এক ভদ্রলোকের বাড়ী চড়াও করে। ভদ্রলোকটী ঘরের বাহির হইতেই তাহাকে উহারা ভয়ানকভাবে আঘাত করিল। বিপদ গুরুতর দেখিয়া গৃহিণী দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া উহা চাপিয়া ধরিলেন। অন্ততঃ উহাদের একজনের ঢুকিবার মত করিয়া দরজার খানিকটা উহারা কাটিয়া ফেলিল। একদিকে স্বামীর অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণ এবং যাতনায় ছট্‌ফটানি, অপরদিকে ভীত কম্পিত শিশুদের আর্ত্তনাদ। চোখের সামনে এসব দেখিয়াও তিনি নারীসুলভ কোমলতায় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন নাই; বরং সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, একখানি কুড়ুলহাতে উহাদের প্রবেশপথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তির শরীরের কতকটা ভিতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহাকে বধ করিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া নিলেন। এই ভাবে একে একে চারিজনের কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া অবশিষ্টেরা চিন্তিত হইয়া পড়িল। অতঃপর আর কোনো উপায় না পাইয়া উহাদের দুই ব্যক্তি ধূম বাহির হইবার চিম্‌নী বাহিয়া ঘরে ঢুকিবার মতলব করিল। চিম্‌নীর ভিতর দিয়া নামিবার সময় গৃহিণী তাঁহার মেয়েদিগকে চিম্‌নীর মুখে বিছানা রাখিয়া আগুন লাগাইয়া দিতে বলিলেন। আগুনের উত্তাপে এবং

ধোঁয়ায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় উহারা নীচে পড়িয়া গেল। তারপর, গৃহস্বামী নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় উঠিয়া একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়া পিটাইয়া পিটাইয়া উহাদিগকে শেষ করিলেন। ঠিক এই সময় দরজার নিকটে অবশিষ্ট লোকটাকে গৃহিণী এক ঘা মারিতেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। আমি শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি, চরিত্রবলের তুল্য আর বল নাই। আমার মাতাও নাকি এই সকল গুণে গুণী ছিলেন।

২

লেখাপড়ার ইচ্ছাটা আমার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু নিকটে কোনো ইস্কুলের খোঁজ তখনো পাওয়া যায় নাই। কাজেই, অষ্টপ্রহর কুঠার হস্তে বনে বনে ঘুরিয়া গাছ কাটিয়া বেড়াইতাম। প্রত্যহ কুঠার চালনার ফলে একদিকে যেমন আমার শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি ভালো কাঠুরিয়া বলিয়া সে অঞ্চলে যথেষ্ট খ্যাতিও লাভ হইয়াছিল। আমি এই কাজে লাগিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি হজম করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কাজেই, আমার বলিষ্ঠ দেহখানা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সুযোগ পায় নাই। এই সেদিন নিগ্রো-স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় হাসপাতালে যাইয়া ছয় হাজার রুগ্ন ও আহত সৈন্যের প্রত্যেকের সহিত আমি করমর্দ্দন করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের সভাপতির বাহুখানি এইবারেই খসিয়া পড়িবে। কিন্তু আমি জানি, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পদ লাভ করিতে আমাকে যতটুকু চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেষ্টায় আমার দেহখানা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম।

আমার পিতা তাঁহার যন্ত্রপাতি দিয়া টেবিল, চেয়ার, তক্তপোষ ইত্যাদি তৈরী করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে সাহায্য

করিতে যাইয়া আমারও কিছু কিছু জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। আমি তখনই কাঠে কাঠে জোড়া দিয়া আমার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলাম। আমার মা ইচ্ছা করিতেন দুই একটা জিনিষ আমিও তৈরী করি। কিন্তু আমাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমার পিতার নিকট আমি কোনো সহানুভূতি পাই নাই। একটী মাত্র কাজ দেখাইয়াই আপাততঃ আমার কাজ শেষ করিলাম। কারণ আমি ছিলাম পিতার কাজের যোগানদারমাত্র।

নূতন ঘরের একদিকে একটা মৈ ছিল। উহা দ্বারা উপর তলায় উঠিতে পারা যাইত। আমি রাত্রিকালে ঐ মেজেতে শয়ন করিতাম। শয্যার ভিতর ছিল মাত্র একখানি কম্বল। সেদিনে আমার পিতামাতার পক্ষে আর বেশি কিছু জুটাইবার ক্ষমতা ছিল না সত্য, কিন্তু ঐ কম্বলখানাকে সম্বল করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর প্রতি রজনী গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছি।

কিছুদিন বন্দুক লইয়া বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইলাম। দুই একটী টার্কীও শিকার করিয়াছিলাম। কিন্তু এই সময়ে পড়িবার আগ্রহ আমার ভিতরে যেন আমাকে আছ্ড়াইয়া মারিতেছিল। কিন্তু পড়িব কি! বাইবেল আর বানানের বই পড়িয়া পড়িয়া আমার মেজাজ খারাপ হইয়া যাইবার অবস্থা হইল! আমি শেষ পর্য্যন্ত এই বাইবেল-পড়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার

মনে তখন লেখাপড়ার ভীষণ ক্ষুধা। পেট জ্বলিয়া যাইতেছিল —কিন্তু খাদ্য নাই। ভালো হউক, মন্দ হউক, আমার কোনো বাদ-বিচার করিবার শক্তি তখন ছিল না। দিবানিশি আমার অন্তরাত্মা কখনো দুঃখে কাঁদিয়া, কখনো রাগে গর্জ্জিয়া, কখনো বা ভিখারীর মত বেদনাজড়িত করুণার সুরে কেবলই চাহিতেছিল বই, বই! আর কিছু নয়, শুধু বই।

এমন সময়ে হঠাৎ এক মড়কের প্রাদুর্ভাবে আমার মাতা ইহধাম ত্যাগ করিলেন। আমার বয়স তখন নয় বৎসর। মাতার মৃত্যুর পর আমার মন যেন দমিয়া যাইতে লাগিল। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, হৃদয় অন্ধকার। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-সম্পদ তাঁহার নিকট শুধু একটা কল্পনার বস্তুই রহিয়া গেল! ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, আমি সকল সময় কেবল তাহাই চিন্তা করিতাম। ইচ্ছা হইত, ইণ্ডিয়ানার জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অসহ্য যাতনায় আমার বুকটা সেদিন ভাঙ্গিয়া গেলেই বোধ হয় আমি শান্তি পাইতাম। কোথায় মৃত্যু, কোথায় তার ঘর, কেমন তার রূপ—এই চিন্তাই আমার অন্তরে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। আমি ভাষা হারাইলাম, অশ্রু হারাইলাম। মনে হইয়াছিল, এজগতে আমার যা ছিল তা হারাইয়াছি—একেবারে হারাইয়াছি। যাহা হারাইয়াছি আর তাহা ফিরিয়া পাইব না। মনে হইল আমার সকল শক্তি, সকল উৎসাহ

একেবারে ইণ্ডিয়ানার বিজন বনে চিরদিনের মত সমাহিত করিয়াছি। ঘরে থাকিতে আর ইচ্ছা হইত না।

নিবিড় জঙ্গলের কুঁড়ে ঘরে যিনি ছিলেন আমার বর্ত্তমানের উদ্যম, ভবিষ্যতের আশা, অবসাদে আনন্দময়ী, সফলতায় জয়শ্রী, নিরাশার অন্ধকারে মঙ্গলদীপ, অভাবে সম্পদ্‌লক্ষ্মী ;— তাঁহার অভাবে কেমন করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, দীর্ঘকাল কেবল এই চিন্তাই করিয়াছি।

এতদিন পরে পাঠশালার দুইটী বিদ্যা—হাতের লেখা এবং চিঠি-লেখার পদ্ধতিটা—কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইয়া মনে মনে বেশ একটু আনন্দ পাইলাম। আমার মাতার মৃত্যুর মাস কতক পরে আমার পিতা পুরোহিতকে আসিবার জন্য পত্র দিতে বলিলেন। চিঠি লিখিতে যাইয়া এক মহাভাবনায় পড়িলাম। আমার পিতাকে বলিলাম, হয়ত পুরোহিত মারা গিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি জবাব দিলাম, আমার মা মরিয়াছেন, সেই সংবাদ যেমন পুরোহিত জানেন না, তেমনি পুরোহিতও মরিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার মৃত্যু-সংবাদও আমরা জানি না। যাহা হোক, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট চিঠি লিখিতে হইল। চিঠি লেখা হইলে পড়িয়া আমার পিতাকে শুনাইয়া চিঠি ডাকে দিলাম।

আমার চিঠি শুনিয়া পিতা খুব খুসী হইয়াছিলেন। সেদিনে ইহা একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছিল। আমার পিতা ধারে-কাছে যাহাকে পাইয়াছিলেন এই খবরটা তাহাকে বলিতে

তাঁহার একটুও ভুল হয় নাই। এই সুখ্যাতির ফল দাঁড়াইল এই যে, অতঃপর প্রতিবেশীদের চিঠি লিখিয়া দেওয়া আমার এক কাজ দাঁড়াইল। তাহাদের সুবিধা হইল কাজের দিক দিয়া, আর আমার অপার আনন্দ হইত চিঠি লিখিয়া দিয়া। এখন বহুদূরে দীর্ঘপ্রবাসী আত্মীয়-স্বজনের নিকট চিঠি দিয়া তাহারা যে আনন্দ পাইতেন, তাহা দেখিয়া আমিও কম আনন্দিত হই নাই। এইরূপে, দূরে যে ছিল তাহাকে নিকটে আনিয়া, পরকে আপনার করিয়া, আপনার যে বহুদূরে থাকিয়া থাকিয়া সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল তাহাকে আবার জোড়া দিয়া ইহাদের নিকট এক নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলাম।

আমার এত সাধের প্রথম-লেখা পত্রখানার জবাব না পাইয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। প্রত্যহ উহার জন্য ব্যাকুলতা বাড়িয়া যাইতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত জবাবের আশা ছাড়িয়া দিলাম। মাস তিনেক পর হঠাৎ পুরোহিতকে আসিতে দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। কথায় কথায় জানিয়া লইলাম, আমার লেখা চিঠি পাইয়াই তিনি আসিয়াছেন।

আমার মাতার শ্রাদ্ধদিবসে পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য বহু দূব দূরান্ত হইতে লোক-সমাগম হইয়াছিল। সেদিনে পুরোহিতদের অনেকেই জ্ঞান-অর্জ্জন এবং অনুশীলনের কোনো ধার ধারিতেন না। সেদিনে ইস্কুলের পণ্ডিতি এবং পৌরহিত্য যত সুবিধায় ও সহজে হইতে পারিত আর কোনো

কাজই তত সহজে হইবার উপায় ছিল না। যে দুইটী কাজ সবচেয়ে বেশি শক্ত তাহা ইহারা এত সহজে কেমন করিয়া সম্পাদন করিতেন! লোককে ফাঁকি না দিলে তো করিবার সামর্থ্য ইহাদের একদম ছিল না! ইহারাই ছিলেন সেদিনে সমাজের লোকের ধর্ম্মের এবং চরিত্রগঠনের কর্ত্তা। ইহারা লোককে মিথ্যার জন্য পরকালের শাস্তির ভয় দেখাইতেন। এই সকল চিন্তা অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল যে, লোকের অজ্ঞতা এবং মূর্খতাই ইহার একমাত্র কারণ। এই সুযোগ লইয়াই ইহারা নিজেরা মিথ্যার ব্যবসা অবাধে চালাইয়া যাইতেছিলেন। অবশ্য সকলেই হীনপ্রকৃতির ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেকে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া এইরূপ নিষ্কাম জীবন যাপন করিতেন। ইহাদের ভিতর চরিত্রবানও যথেষ্ট ছিলেন। যখন যে কাজ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তাহা অত্যন্ত শুদ্ধভাবে সম্পাদন করিতেন। এইরূপ বহু বহু ধর্ম্মপ্রচারক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া, প্রত্যহ লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া লোককে ভগবৎ মহিমা শুনাইতেন। পথ চলিবার সময় ঘোড়ার পিঠে বসিয়া শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। যেখানে রাত্রি হইত সেইখানেই বিশ্রাম করিতেন। এই রকম কত রজনীর কত বিশ্রাম জনমানবহীন জঙ্গলের ভিতর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে! তাহার খোঁজ যাহারা রাখিত তাহারা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতেছে। এই সকল রাত্রি তাঁহারা মুক্ত আকাশের তলে মাটীতে শুইয়াই

কাটাইয়া দিতেন। ঈশ্বরের কথা লোককে শুনাইয়া তাঁহারা পারিশ্রমিক কিছুই লইতেন না। পরিচ্ছদের কোনো জাঁক-জমক তাঁহাদের ছিল না, আহারেও কোনো আড়ম্বর ছিল না। শুধু গৃহস্থের মঙ্গলের জন্যই, তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই দারিদ্র্য-দুঃখময় জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

আমার পিতা একদিন কোথা হইতে একখানা "পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস্" আনিয়া পড়িতে দিলেন। বইখানা তাঁহারও যে শুনিবার ইচ্ছা, তাহাও জানাইয়া দিলেন। এতকাল পরে এক-খানা ভালো বই পাইয়া মনটা একটু সরস হইল। এই বইখানি বার দুই পড়িবার পর 'কথামালা'ও একখানা জুটিয়া গেল। আমার মনটা মজিয়াছিল তাহাতেই বেশি। আমি মন্ত্রের মতো এই বইয়ের অনেক কথা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পরবর্ত্তীকালে ঐ সকল উপদেশ কাজে লাগাইয়া আমি যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি।

পড়ার দিকে মন দিয়া আর এক বিপদে পড়িলাম। দৈনিক কাজ কর্ম্ম ঠিক ঠিক মতো চলিতেছিল না বলিয়া, আমার পিতা তাড়া দিতে লাগিলেন। আমি অলস হইয়া যাইতেছি মনে করিয়া পিতা একদিন আমাকে কাজ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাঁহার সাম্‌নে ছিল গৃহস্থের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র, আর আমার সাম্‌নে ছিল অনন্ত প্রসারিত জ্ঞানসমুদ্র। আমার পিতার ইচ্ছা ছিল, নিজের জমি আবাদ করিয়া বিত্তশালী হওয়া, আর আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল, নিজেকে মানুষ করা, অবনত ইয়াঙ্কি-সমাজ

চষিয়া নর-নারীকে মানুষ করিয়া তোলা। আমাদের উভয়ের ভিতর গোল বাঁধিয়াছিল এইখানে।

এই সময়ে জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী একখানা হাতে পড়িল। একজন খাঁটী খৃষ্টান তাহার ধর্ম্মগ্রন্থকে যতখানি শ্রদ্ধা করেন, ঠিক ততখানি শ্রদ্ধার সহিত আমিও এই বই-খানাকে গ্রহণ করিলাম। ওয়াশিংটন ছিলেন আমাদের জাতির পিতা—স্বাধীনতা-সমরের প্রধান সেনাপতি—মূর্ত্তিমান মনুষ্যত্ব। একবার, দুইবার, বহুবার বইখানি পড়িলাম, আলোচনা করিলাম, তাঁহার মতো হইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। আমার যুগযুগান্তের সঞ্চিত ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে অঞ্জলি দিলাম।

৩

আমার দিদি আমার চেয়ে কিছু বড়, তাহা হইলেও সংসারের কাজকর্ম্ম সে কোনো রকমে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু আমার পিতার চোখে তাহার এই খাটুনিটা অত্যন্ত বেশি বিবেচিত হইল। কাজেই আমার পিতা এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পর এক রমণী চারি ঘোড়ার এক মালটানা গাড়ীতে নানা রকম আসবাব-পত্র, ভালো ভালো বিছানা, সুন্দর সুন্দর বাসন কোষণ এবং দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র লইয়া আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীরূপে আমাদের ঘরে আসিলেন। এতগুলি জিনিষপত্র এবং আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহাকে খুবই বড় লোক মনে না করিয়া পারি নাই। ভালো ভালো জিনিষ আমাদের ঘরে আসিল দেখিয়া আমি খুবই গর্ব্ব বোধ করিয়াছিলাম। সেদিন এই জড় বস্তুগুলির আড়ালে যে সুন্দর আত্মা বিরাজ করিতেছিল, আমার জীবনের ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে সে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আমার বিমাতা সেদিন মায়ের স্থানে দাঁড়াইয়া আমাকে এমন আদর করিয়াছিলেন, যা কম-বেশি কোনো দিক হইতেই অস্বাভাবিক হয় নাই। বহুদিন সন্তানের অদর্শনের পর, প্রথম

দর্শনে মায়ের যে ভাব হওয়া উচিত, তাঁহার নিকট সেইদিন ঠিক তাহাই পাইয়াছিলাম। আমি যে মাতৃহীন, এটা তাঁহার ব্যবহারে ভুলিয়া গেলাম, এবং চিরদিনের মতো তাহা ভুলিতে আমাকে বাধ্য করিল। প্রথম দিন হইতে আমিও তাঁহাকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারি নাই। তাঁহার নিজের সন্তানদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, আমার দিদি তাঁহার বড় মেয়ে এবং আমি তাঁহার বড় ছেলে। তাঁহার উচ্চ হৃদয় চিরদিনই এক ভাবে রহিয়াছে। এখন আমরা এক মায়ের সন্তান, তিন বোন্ এবং দুই ভাই। মাতাপুত্রের এমন আশ্চর্য্য মিলন আর কখনো হইয়াছে কিনা জানিনা।

আমার বিমাতার লেখা-পড়া এবং সামাজিক আদব-কায়দা ইত্যাদির জ্ঞান, আমার জননীর চেয়ে অনেক বেশি। আমার নূতন মা আসিবার পর আমাদের ঘরের মেজে পাকা হইল, দরজা-জানালায় একটা সৌন্দর্য্য হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুঝিলাম, এইগুলির অভাবে ঐ সকল আসবাবের মর্য্যাদা বজায় থাকিত না। আমাদের গৃহখানি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া প্রাণ পাইবার জন্যই যেন আমার বিমাতার অপেক্ষা করিতেছিল, বলিতে পারি।

আমার দুই মাকে আমি দুই রূপে দেখিলাম। একজন শান্ত, নিরাভরণা, নিরলঙ্কারা গৌরী, সদা প্রসন্নময়ী, শরতের নীলনভোমণ্ডল, ভাবদৌলতের মালিক ; আর একজন সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ধবলগিরি, চিরকল্যাণময়ী, খরস্রোতা তরঙ্গিনী, ভাব-

দৌলতের জহুরী, শরতের নীলাকাশে নবোদিত চন্দ্রমা। দুই জনেরই অন্তর নির্ম্মল—মাতৃস্নেহ চিরপ্রবহমান—অনন্ত, অফুরন্ত।

আমিই মা-র সব চেয়ে বেশি স্নেহের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার কাপড় চোপড় ছিল না। তিনি আসিয়াই আমার জন্য জামা-কাপড়ের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। সন্তানকে কেমন করিয়া মানুষ করিতে হয়, তাহা তিনি ভালোরূপেই জানিতেন। আমার মা নাকি প্রথম দিনেই আমার ভিতরে কি এক শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, যার জন্য তিনি সব ভুলিয়া আমাকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটা অখণ্ড কর্ম্মশক্তি, পরিপূর্ণ বিবেচনা, অক্লান্ত শ্রমশীলতা এবং নিখুঁৎ গৃহিণীপনা, একযোগে আমার মায়ের ভিতর দিয়া সমুদয় ইণ্ডিয়ানাকে দুনিয়ার সাম্‌নে তুলিয়া ধরিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

এতদিন পরে একটা নূতন ইস্কুল বসিল। মা ভাবিলেন, আমার জন্যই এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। ইস্কুলের প্রথম দিনে মা আমাকে যে ভাবে সাজাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই জঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা নূতন ব্যাপার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ভালো পোষাক পাইয়া আমার মনের কোনো পরিবর্ত্তনই হয় নাই। শুধু তাঁহার হৃদয়টা যে কত বড় আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। আমি ইস্কুলের সন্ধান পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কিন্তু ইস্কুলে যাইয়া আমার

আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির দিক দিয়া কিছুই পাইলাম না। আমি দিবারাত্র খুঁজিতাম সেই মানুষ, যে আমাকে মানুষ হওয়ার উপায় বলিয়া দিতে পারে; আমি খুঁজিতাম সেই বই, যাহা মানুষকে মানুষ করে। আমার মা এই সময়ে আমাকে বড় বড় লোকদের জীবনী শুনাইতেন। নানা রকম দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া তাঁহাদের মানুষ হওয়ার বিবরণ শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, একদিন-না-একদিন আমিও আমার মানুষ হওয়ার পথ পাইবই। ইয়াঙ্কি-স্থানের এই বিরাট জঙ্গল কিছুতেই আমার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

স্থানীয় এক ব্যক্তি পুরাতন শিক্ষকের ইস্কুল ঘরে শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই শিক্ষক মহাশয় আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়া আমার পিতামাতাকে খুসী করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধারণার জন্যই মা তাঁহাকে একজন জ্ঞানীলোক ঠাওরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয় সভ্য-সমাজের আদব-কায়দাও শিক্ষা দিতেন। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যেই তিনি ছাত্রদিগকে মানুষ করিতে চাহিতেন না। এই ইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিবার বৎসর তিনেক পর, মাইল পাঁচেক দূরে আর এক ইস্কুলে প্রবেশ করিলাম। আমার শিক্ষক মহাশয়ের নিকট যাহা শিখিবার ছিল তাহা শিখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। এইখানেই আমার ছাত্র-জীবনের শেষ হইল। এই পর্য্যন্ত অনেক পাঠশালার চৌকাঠ

মাড়াইয়াছি, অনেক শিক্ষকের হাত দিয়া পার হইয়া আসিয়াছি সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার শিক্ষাকাল পুরা এক বৎসরও দাবী করিতে পারে নাই।

এখন এদিকে সেদিকে বই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পূর্ব্বে ওয়াশিংটনের জীবনী একখানা পড়িয়াছিলাম, এখন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচিত আর একখানার সন্ধান পাইলাম।

আমি ওয়াশিংটনের জীবনী এত বেশি পড়ি কেন, আমার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, "যেহেতু এ পর্য্যন্ত তাঁহার মতো লোক আর জন্মগ্রহণ করে নাই। একমাত্র তাঁহার জন্যই আমেরিকার যথেষ্ট গর্ব্ব করিবার আছে।" বন্ধুটী বলিলেন "এটা তোমার মনগড়া কথা। ইংরেজরা তাঁহাকে পাত্তা দিবে না।"—"তার কারণ কি জান হে, এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে আর কেহ এমন চাবুক লাগাইতে পারে নাই। পদে পদে সাত সাতটা বৎসর তাহারা ওয়াশিংটনের হাতে কম লাঞ্ছিত হয় নাই। এর পরেও কি কেহ কাহাকেও সহজে পাত্তা দেয়! তবু আমার মনে হয়, ওয়াশিংটনকে ইংরেজরা যতখানি সম্মান করে, হয়ত তুমি আমি ততখানি করি না।"

বই পাওয়ার দিক্ দিয়া ভরসা আমার বিশেষ কিছুই ছিল না। কারণ তখনকার দিনে বই-হারানো, অযত্নে বই নষ্ট করা, বই চুরি করা, পড়িয়া বই ফেরৎ না-দেওয়া ইত্যাদি নানা দোষ আমাদের ভিতর প্রবল ছিল। যাহাদের বই

রাখার অভ্যাস ছিল, দায়িত্বজ্ঞানহীন কতকগুলি লোকের ব্যবহারে, এই জন্যই তাহাদের দেশ ছাড়িয়া পলাইবার অবস্থা হইয়াছিল। পড়িতে না দিলে ইহারা দুঃখিত হইতেন, দিলে ঐরকম একটা কাণ্ড ঘটাইতেন। পরের বইকে নিজের বইয়ের মতো যত্ন করা আমার জন্মগত অভ্যাস, এই ভরসায় সেই দিন সন্ধ্যার পরই বইখানার জন্য রওনা হইলাম।

বই লইয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। সে রাত্রি যে আমার কি আনন্দময় বোধ হইয়াছিল তাহা আমার মা ছাড়া আর কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। জিনিষের যত্ন-লওয়া সম্বন্ধে মা স্বভাবসিদ্ধ ছিলেন। আমার হাতে ধার করা বই দেখিয়া মা সাবধান করিয়া দিলেন। সেই রাত্রিতে যতটা সম্ভব হইল পড়িয়া ফেলিলাম। অবসর পাইলেই পড়িতাম। যখন পড়িতাম না তখনও বইখানি কাছে কাছে রাখিতাম। অতঃপর এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে আমি অন্তরে এক বিষম ঘা পাইলাম। এ পর্য্যন্ত যাহা হয় নাই সেদিন তাহাই ঘটিয়া গেল। আমার গর্ব্ব, আমার অভ্যাস, বৃথা ভাবিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বইখানি পড়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন এক সন্ধ্যায় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঘরে অতি সাবধানে এক জায়গায় বইখানি রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রিতে হাওয়ার গতি-পরিবর্ত্তনের ফলে বৃষ্টির ছাট্ আসিয়া বইখানাকে একেবারে ভিজাইয়া শেষ করিয়া দেয়। ভোরে উঠিয়াই সর্ব্ব প্রথম

বইখানির উপর নজর পড়িতেই দেখিলাম, জলে বইখানি ফুলিয়া তিনগুণ মোটা হইয়া গিয়াছে, মলাটটা নষ্ট হইয়াছে। আমি বইয়ের অবস্থা দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। মা খুবই দুঃখিত হইলেন, আমাকে সহানুভূতিও দেখাইলেন যথেষ্ট, কিন্তু বইয়ের নষ্ট অবস্থার পুনরুদ্ধারের কোনো উপায়, আমার কি মা-র কাহারো মাথায়ই আসিল না। শেষ পর্য্যন্ত আগুনে শুকাইয়া জলটা দূর করিলাম বটে, কিন্তু বইয়ের সৌন্দর্য্য আর ফিরিল না। নানা রকম ভাবনা-চিন্তার আড়াল হইতে বইয়ের মালিকের বিকট চেহারাখানা মনের সাম্‌নে মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল। মা বলিলেন, "যা হইয়াছে তার জন্য আর বৃথা ভাবিয়া কি হইবে! যাঁহার বই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বইয়ের দাম দিয়া দাও।" আমার পক্ষে সেও তো আর এক বিপদ। মাকে বলিলাম, "আমি পয়সা কোথায় পাইব?"—"দাম দিতে গেলে যে নগদ পয়সাই দিতে হইবে তা কে বল্লে, কাজ করিয়াও তার দাম দেওয়া যায়। বই লইয়া যাইয়া দেখনা, তিনি কি বলেন।" আমার যে চরিত্রের এত গর্ব্ব ছিল, এখন তাহাকে মাথা নত করিয়া সেখানে কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিব, সেই ভাবনায় আমার বুক শুকাইয়া যাইতে লাগিল। মা-র নানা রকম ভরসা পাইয়া অগত্যা বই লইয়া রওনা হওয়াই স্থির করিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টি কমিলে বই লইয়া রওনা হইলাম।

আমার হৃদয় তখন দুঃখে ক্ষোভে ভারাক্রান্ত। বইয়ের মালিক আমাকে দেখিয়া খুবই খুসী হইলেন। কিন্তু বইখানি বাহির করিতেই তিনি চটিয়া উঠিলেন। এই রকম অবস্থায় রাগ করার জন্য আমি কিছুই মনে করি নাই। যে কোনো লোকই ঐ অবস্থায় রাগ করিতে পারিত। তদুপরি অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাহার মেজাজটা অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর কারণটা শুনাইলাম। তথাপি যখন বারবার শুনিতেছিলাম, "অসাবধানতা", "পরের বইয়ের জন্য চমৎকার দরদ বটে" ইত্যাদি, তখন আমার মনে হইয়াছিল, কেহ ইহার পরিবর্ত্তে যদি আমাকে চাবুক মারিত, তাহা হইলেও আমি বেশি কিছুই মনে করিতাম না। আমি তাঁহাকে বইয়ের দাম দিব, এই কথা আগাগোড়া সকল সময়ই বলিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু যখন তাহাকে বলিলাম "বইয়ের নগদ দাম দিতে পারিব না, কাজ করিয়া দাম দিতে চাই, আপনার হাতে কোনো কাজ আছে কি ?" তখনই ভদ্রলোকটীর রাগ কমিয়া গেল। আমি যথেষ্ট আনন্দ বোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, "কাজ ! তাতো যথেষ্টই আছে হে", বলিয়াই চিতা বাঘের মত গর্জ্জন করিতে করিতে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

বলিলাম, মহাশয় বইয়ের মূল্য কত ? আমি ইহার পুরা দাম দিতে রাজি আছি। কাজ করিয়া আপনার বইয়ের দাম দিয়া এই বইখানা আমি লইব। এখন বইখানা আপনার নিকট থাকুক।

মেজাজটা হঠাৎ শান্ত হইল দেখিয়া আমি লোকটার যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারি নাই, এবং তখন আমার অপরাধ যে কত বেশি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি খুব শান্তভাবে বলিলেন, "দেখ, আমার জমির শস্যগুলির ভাবনায় আমার মেজাজটা বড় ভালো নয়। এখনই সেগুলি কাটা উচিত, অথচ হাতে আমার এত কাজ যে, আমার মরিবার ফুসরুৎ নাই। কি যে করি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর তাহা হইলে বইয়ের দামটা এক রকমে উশুল হইয়া যায়।"

—"বেশ, তাই হবে। কতটা জমি কাটতে হবে?" অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "সবটা! সবটা না কাটিলে চলিবে কেন? তুমি বোধ হয় ফাঁকতালে বইখানা পাওয়ার মতলবে আছ, না?"

আমি তাহার এই অত্যন্ত চড়া দাবীতে খুবই আশ্চর্য্য হইলাম। বুঝিলাম, সে বেশ একটা সুযোগ পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। কাজেই, কাজ করিতে রাজি হইলাম। বাড়ী পেঁাছিয়া মাকে ব্যাপারটা জানাইলাম। আমার পিতা-মাতা উভয়েই দুঃখিত হইলেন। তবু একটা বন্দোবস্ত যে করিতে পারিয়াছিলাম, ইহাতে তাঁহারা খুব খুসী হইলেন।

পরদিন ভোরে আমি শস্য কাটিবার জন্য রওনা হইলাম। কত বিঘা জমিতে শস্য ছিল তাহা খোঁজ লওয়ার দরকার মনে করি নাই। কাজে যখন হাত দেওয়া হইয়াছে তখন তাহা

শেষ করিতেই হইবে। তবে এইটা বুঝিয়াছিলাম যে, দিন কতক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিলে তবেই উহা শেষ হইতে পারে। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া, অপরে যাহা কম-পক্ষে পাঁচ দিনে শেষ করিতে পারিত, তাহা তিন দিনে শেষ করিয়াছিলাম।

লোকটা যে ভয়ানক মতলববাজ, তাহা তাহার এই কাণ্ড হইতেই বুঝিতে পারিলাম। তথাপি বইখানা আমার হইবে মনে করিয়া, সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু শস্য-কাটার শেষেও বইখানা আমার হইল না। লোকটী, তাহার স্ত্রীকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করিবার জন্য দাবী করিয়া বসিল। আমার দ্বারা কাজ ভালো চলিবে না মনে করিয়া, আমার দিদি আসিয়া কাজ করিতে লাগিল। আমি দৈনিক সাড়ে বারো আনা মজুরী লইয়া অন্যান্য কাজ করিতে লাগিলাম। তাহার একখানি ঘর তৈরী করিয়া উহাতে মাটী লাগাইয়া বাসের উপযোগী করিয়া ফেলিলাম। লোকটীর এত বইপড়া, এত জ্ঞানসঞ্চয়ের প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাইলাম। তাহার নীচতায় আমি যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাদের স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

এই সামান্য মজুরীতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ভিতর কখনো এক-আধ মিনিট বিশ্রাম করিতাম। যদি কোনোদিন কাজে লাগিতে দুই এক মিনিট দেরী হইয়া যাইত তাহা হইলে, মনিব অকথ্য গালাগালি দিয়া ক্ষতিটা আদায় করিয়া লইতেন।

অবশ্য তার জন্য তাহার কোনো কথায় আমি কোনোদিন প্রতিবাদ করি নাই।

এত কষ্ট, এত গালাগালি আমি ভুলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম শুধু এক কারণে—সেখানে অপর্য্যাপ্ত বই ছিল। প্রত্যহ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আমি ঐ সকল বই পড়িতাম। আমার স্মরণশক্তিটা প্রখর ছিল, তাই রক্ষা। ঐ সকল বইয়ের আবশ্যক অংশগুলি আমার স্মৃতিতে এখনও আঁকা রহিয়াছে। বাড়ী যাইবার সময় গৃহস্বামী আমার বইখানা দিলেন, নগদ টাকাও কিছু পাইলাম। ঐ টাকাটা আমি আমার পুঁথিপত্র কিনিয়া খরচ করিয়াছিলাম।

৪

বৎসর ষোল বয়সের সময় এক চাক্‌রী জুটিল। বেশি টাকার মজুরীতে এই প্রথম—মাসিক বেতন ১৮৶০। আসল কাজটা ছিল, খেয়া নৌকা চালানো। কোনো কাজে আমার কোনো দিন আপত্তি ছিল না। বিশেষতঃ নৌকা চালানো আমি সব চেয়ে বেশি পছন্দ করিতাম। এই কাজের সঙ্গে আমাকে চাষবাস, রান্নাঘরের কাজ এবং বাড়ীর অন্যান্য কর্ম্ম, যাহা সাধারণতঃ চাকর-বাকররা করিয়া থাকে, আমাকে তার সবই করিতে হইয়াছে। কোনো কাজকে আমি ছোট মনে করিয়া যেমন ঘৃণা করি নাই, বড় মনে করিয়া তেমনি ভয়ও পাই নাই। কাজের ভিতর ছোট-বড়র বিভাগ করিলে কাজ মরে না, মরে ধনে-প্রাণে তাহারা, যাহারা বিভাগ-কর্ত্তা। একে গায়ে জোর ছিল, তার উপর বয়সটাও বাড়িয়া যাইতেছিল, কাজেই ঐ সব কাজ আমি অনায়াসেই করিয়া ফেলিতাম। কাজ লইয়া গড়িমসি করাও আমি ভালো মনে করি না। আমার ঐ বয়সে খুব জোয়ান লোকও আমার সঙ্গে কাজে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। দিন দিন শক্তি যেমন বাড়িয়া যাইতেছিল, উঁচুতেও তেমনি ছয় ফুট চারি ইঞ্চিতে পৌঁছিয়াছিলাম। আজ অবশ্য উঁচুতে আমি পুরা সাত ফুট।

বেশি ঘুমানো অথবা অনাবশ্যক বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া ঘুমের আরাধনা করা আমি পছন্দ করি না। বোধ হয়, সুকোমল শয্যা জোটে নাই বলিয়াই, আমি এই ভীষণ পাপ অলসতা হইতে দূরে থাকিতে পারিয়াছিলাম। এই কাজে লাগিয়া বুঝিয়াছিলাম, নিদ্রা মানুষের যেমন অতি প্রয়োজনীয়, অতি নিদ্রা আবার তেমনি মানুষের পরম অনিষ্টকারী। এই নিদ্রার হাত এড়াইতে না পারিলে মানুষের উন্নতি অসম্ভব। ছোটবেলায় কম্বলে শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলাম বলিয়াই, চাকূরী করিতে যাইয়া ঘুম হইতে উঠিতে কোনো কষ্ট হয় নাই, অথবা আমাকে জাগাইবার জন্য আর একজনকে বহাল করিতেও হয় নাই। আমি প্রত্যুষে সকলের আগে ঘুম হইতে উঠিয়া উনুনে আগুন দিতাম, রান্নার জন্য জল ধরিতাম, তারপর ঘোড়ার ঘর পরিষ্কার করিয়া অন্যান্য কাজে হাত দিতাম। যখন সব শেষ হইয়া যাইত, গৃহিণী তখন ঘুম হইতে উঠিতেন। কাজে হাত দিলে তাহা যথাসম্ভব সত্বর করিতে না পারিলে আমার যেমন ভালো লাগে না, উহার বিরুদ্ধে তেমনি কোনো সমালোচনা চলে ইহাও আমি ইচ্ছা করি না। আমার কাজ দেখিয়া সকল দিক হইতেই গৃহিণী আমাকে ধন্যবাদ দিতেন। আমি উহাকে তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহই মনে করিতাম। এই ধন্যবাদ আমার নিকট উপরি-পাওনার সামিল ছিল। কারণ, কাজ যখন মাথায় লইয়াছি এবং তাহার উপযুক্ত মূল্যও যখন হাতে আসিতেছে, তখন ঠিক ঠিকমতো কাজ না-করাটা নিতান্তই

অন্যায়। বিশেষতঃ শিক্ষিত লোকের পক্ষে খুবই নিন্দার বিষয়। আমি মনে করি, সকল কাজই যদি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে একদিকে কাজ যেমন সুন্দর হইবে, অন্যদিকে অশিক্ষিত সমাজ তেমনি সস্তায় জীবিকা অর্জ্জনের আশা ছাড়িয়া দিয়া মানুষ হইয়া মানুষের মতো কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

এখানে আমার একটা খুব বড় লাভ হইয়াছিল—অনেক বই পাইয়াছিলাম। তাহার ভিতর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আমার পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম। অন্যান্য দুই চারিখানা বইও আমার যথেষ্ট কাজে আসিয়াছিল। আমি মনিবপুত্রের সহিত রাত্রিতে উপরতলায় নিদ্রা যাইতাম। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুমাইতেন। আমি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া পড়িতাম, এজন্য তিনি যথেষ্ট বিরক্ত হইতেন। তখন মনে হইত, এ সংসারে গরীবের বিপদ সব দিকে। তাহার এই বিরক্তি এবং বিরক্তির সহজাত ফল আমাকেও অনেকদিন অনেক রকমে বিরক্ত করিয়াছে। কিন্তু আমি সেদিন আমার কাজ গুছাইবার চেষ্টায় ছিলাম। আমি এই রকম পুস্তকের এক এক খণ্ড পড়িতে পাইলে, বিনা বেতনে এবং একমাত্র খোরাকী লইয়া, যে কোনো মনিবের নিকট পুরা খাটুনি খাটিতে একটুও আপত্তি করিতাম না। এই দুপুর-রাত্রির পড়া লইয়া আমার মনিবপুত্র এক রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া রাগের ঝোঁকে আমাকে এক ঘুষি মারিয়া বসিলেন। কিন্তু আমি

তাহার উপর একটুও রাগ করি নাই। সেদিন এই ঘুষির ঠিক ঠিক জবাব দিলে মনিবের প্রতিই অন্যায় করা হইত এবং নিজেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া ফেলিতাম। শুনিয়াছি, পরবর্ত্তী কালে আমার এই মনিবপুত্রটী বলিয়াছিলেন, "একজন লোক দেখিয়াছি, যে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর দুপুর রাত্রির পরেও সহজভাবে জাগিয়া লেখাপড়া করিত। আবার ভোরে সকলের আগে ঘুম হইতে উঠিয়া বাড়ীর কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলিত। লোকটীর মাথায় বোধ হয় একটু গোলমাল ছিল, নতুবা এক রাত্রিতে আমি তাহাকে যে ঘুষি মারিয়াছিলাম, তাহার পাল্টা-জবাবে ঘুষিতো সামান্য, আমাকে বেত মারিলেও সেদিন তাহার পক্ষে অন্যায় হইত না।"

এই বাড়ীতে থাকার সময় একটা নূতন বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলাম। সেটী শূয়রমারা-বিদ্যা। আমার উপর মনিবের অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, লিঙ্কল্‌ন্ ইচ্ছা করিলে শূয়রমারার মতো কঠিন কাজও অনায়াসে করিতে পারে। তাঁহার স্বার্থ ইহার ভিতর কতখানি ছিল, সে কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে তাঁহার এই বিশ্বাস আমার ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা লাভের পক্ষে একটা মোটা রকমের মূলধন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এইখানে থাকিতে থাকিতে এই বিদ্যায় আমি এতটা ওস্তাদ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, অতঃপর অন্যান্য গৃহস্থরা এই কর্ম্মের জন্য মাসের ভিতর ত্রিশ দিন আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। নিজের হাতে কাজ না থাকিলে অপরের

কাজে আমাকে খাটাইয়া আমার মনিব দৈনিক সাড়ে পোনের আনা রোজগার করিতেন। আমি এমন একটা বিদ্যায় ওস্তাদ হইয়াছিলাম, যার অ আ ক খ-ই সে মুল্লুকে কেহ আয়ত্ত করিতে সাহস করে নাই।

আমার সম্বন্ধে মনিবের মতামত জানিবার ইচ্ছাটা বহুদিন আগেই আমার ভিতরে জাগিয়াছিল। নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্য নহে, ভুল-ত্রুটী সংশোধনের জন্য। আমি পয়সা লইয়া ঠিক ঠিক কাজ করিতেছিলাম জানিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কারণ, এখানকার মতামত আমার পক্ষে অন্যত্র প্রশংসাপত্রের কাজ করিবে। কাজ নিখুঁৎ হওয়ার দিকে আমার যে বিশেষ লক্ষ্য ছিল, আমার মনিব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হোক, খেয়া নৌকার মাঝি, ক্ষেতের চাষী, রান্নাঘরের যোগানদার, বাড়ীর চাকর এবং ভাড়াটিয়া-কশাই আমি, মনিব-পত্নীর ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসা লইয়া নয় মাস পরে বাড়ী রওনা হইলাম।

এই সময়ে আমার দিদির বিবাহ হয়। প্রাচীন রীতি অনুসারে শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এই বিবাহ উপলক্ষে আমি একটী প্রীতি-উপহার রচনা করিয়াছিলাম। অতঃপর প্রীতি-উপহার-রচনা আমার পক্ষে এক বড় কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার এই সামান্য ক্ষমতা দ্বারা অপরকে খুসী করিতে একটুও ত্রুটী করি নাই। বিবাহের ব্যাপারে যত উৎসব-আমোদই চলুক না কেন, আমি না হইলে নাকি তাহা জমিয়া উঠিত না। এই

জন্য আমার প্রতিবেশীদের আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে কোনোদিন ভুল হয় নাই। বিবাহের ব্যাপারে পুরোহিতের যে সম্মান, যে খাতির ছিল, বিবাহের মজলিসে আমাকেও তাহারা সেই সম্মান এবং সেই খাতির দিতেন। তাহারা যে আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং ভালোবাসিতেন এই সব ব্যাপারেই তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বিবাহ-বাসরে গদ্য-পদ্য এবং হাসি-ঠাট্টার কবিতা আবৃত্তি করিবার জন্য, বন্ধুদের এবং মেয়েদের তরফ হইতে ফরমায়েসের পর ফরমায়েস আসিত। ইহাতে আমি কোনো দিনই বিরক্তি বোধ করি নাই। কারণ তাহারাই আমার দরটা বাজারে বাড়াইয়া দিতেছিল।

বিবাহের বৎসর খানেক পর আমার দিদির মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আমি অন্তরে যে ব্যথা পাইয়াছিলাম, তাহার কিছুমাত্র আজিও উপশম হয় নাই। তাহাকে আমার জননীর পাশেই সমাহিত করা হইয়াছিল।

এবারে বাড়ী হইতে মাইল দেড়েক দূরে এক মুদী দোকানে চাকরী পাইলাম। এটা নামে মুদী দোকান, কিন্তু বিক্রী হইত সব জিনিষই। পল্লীগ্রামে একটা দোকানে পাঁচ রকমের জিনিষ না রাখিলে চলেও না। দোকানের মালিক, কাজ লইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শূয়র মারিতে জানি কি না। আমি বলিলাম, শূয়রমারা হইতে খাওয়া পর্য্যন্ত এ বিদ্যার সব কিছুই আমার জানা আছে। অতঃপর দোকানের চা'ল ডা'লের পরিবর্ত্তে মালিক কয়েকটা ছালছাড়ানো শূয়র

আনিয়া হাজির করিলেন। দোকান চালাইতে পারি কি না জানিতে চাহিলেন। বলিলাম, কখনো একাজ করি নাই, তবে আমি যে রকম কায়দাদুরস্ত এবং মিশুক লোক তাতে খরিদ্দার আমার নিকট হইতে যে ভাগিতে পারিবে না, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। দোকানের কাজে লাগিয়া গেলাম। এখানে আমার কাজ ছিল, গরুছাগলের তত্ত্বাবধানকরা, শূয়রমারা, মাংসকাটা, মাংসগুলিকে কৌটায় প্যাককরা, মালপত্র বাক্স হইতে বাহির করিয়া দোকান-সাজানো, ধানগম মাপা, গুড় এবং মদ নাড়াচাড়া—এর উপর দোকানদারীতো ছিলই। এতগুলি কাজের চাপ এক সঙ্গে পড়িয়া আমাকে মানুষ করিয়াই তুলিতেছিল। মনিবের ধন্যবাদের পরিবর্তে—আমাকে এতগুলি কাজের সুযোগ দেওয়ায়, আমিই তাহাকে ধন্যবাদ দিয়াছি। এই জন্যই আমাকে হা-চাক্‌রী হা-চাক্‌রী করিতে হয় নাই। মানুষ হওয়ার জন্য গরীবের এই রকমে তৈরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখানে কতকগুলি ভালো ভালো বই পাইলাম, যা কখনো পড়ি নাই। তার ভিতর ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী অন্যতম। আমার মালিক একখানি সংবাদপত্র লইতেন, আমি আগাগোড়া তার সবই পড়িতাম। তিনি একজন জবরদস্ত ডেমোক্রাট ছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত রাজনীতি আলোচনা করিবার সুযোগ আমাকে দিয়াছিলেন। এজন্য আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। মনিবের পক্ষে এ উদারতার মূল্য কম নয়! তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে করিতে আমিও ডেমোক্রাট

হইয়া পড়িয়াছিলাম্। বৎসর কয়েক পর যখন "হেন্‌রী ক্লে"র জীবনী আমার হাতে পড়ে তখন আমার মত-পরিবর্ত্তন হয়।

পরে এই দোকানের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় হাজিরা দিতাম। সেখানকার আড্ডায়—ভাবের দোকানে—ভালো ভালো গল্প এবং হাসি-তামাসার দোকানদারী বেশ ভালোই চলিত। হাল্‌কা চিন্তা, হাল্‌কা গল্প—হাল্‌কা যাহা কিছু তাহার যথেষ্ট দাম সেখানে ছিল। আমি ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতাম, গল্প করিতাম সত্য, কিন্তু আমাদের সামাজিক দুর্দ্দশার ছবি দেখিয়া অন্তরে বিষম বেদনা পাইতাম।

যৌবনে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিতেছিলাম, আমাদের সমাজ একটা বিরাট আবর্জ্জনা-স্তূপ। অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত এবং কাণ্ডজ্ঞান-হীন জনসাধারণ, ঐ আবর্জ্জনার ভিতর হইতে উদ্ভিদের মতো মাথা তুলিয়া, সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছিল। তাহারা জানার ভিতর জানিত ধর্ম্ম, অথচ সেই ধর্ম্ম তাহাদিগকে মানুষ করিতে পারে নাই, মুক্তির বার্ত্তাও দিতে পারে নাই। দিয়াছিল কতকগুলি অনাবশ্যক আচার এবং সংস্কারের বাঁধন, আর দিয়াছিল—মদ্যপান, কথায় কথায় শপথ, কুৎসিত আলাপ, কুৎসিত গান ইত্যাদি—ষোলকলায় পূর্ণ করিয়া কুসংসর্গের বিষগুলি।

তাহারা মানুষ হওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল না। মানুষ বলিলে

কি বুঝায় তাহা তাহারা জানিত না। সেই সময়কার ইয়াঙ্কি-চরিত্র-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। আট দশ মাইল হাঁটিয়া গিয়া পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মের মহিমা শুনিতে নিতান্ত বৃদ্ধারাও পিছ্‌-পা হইতেন না। নারীরা শীতের সময়ে শাল কিংবা অন্য কোনো গরম গায়ের কাপড়ের অভাবে ধর্ম্মের মজলিসে যাওয়া বন্ধ করিতেন না। ঘোড়া জুটিলে রাইডিং পোষাকের অভাবে যাওয়া বন্ধ হইত না। তাহারা নিজ নিজ স্বামীর পুরানা ওভারকোট গায়ে দিয়া এবং শিশু-সন্তানকে কাপড় জড়াইয়া ঘোড়া অথবা অন্য কোনো জানোয়ারের পিঠে চড়িয়া রওনা হইতেন। তাহাদের স্বামীরা হাঁটিয়া চলিত। এই রকম বক্তৃতার সময় বৃদ্ধ পুরুষরা জমির কাজ বন্ধ করিয়া যার যার দা-কাস্তে-কোদালি লইয়া, এবং যুবকরা জঙ্গলে শিকার বন্ধ করিয়া নিজ নিজ বন্দুক কাঁধে লইয়াই রওনা হইত। শিকারীরা হরিণ-ছালের পাঁৎলুন ও শিকারী-জামা পরিত এবং দড়ি অথবা চামড়ার ফিতার দুই দিক বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখিত। পুরুষরা ধর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে হাত দুলাইয়া দুলাইয়া চলিত এবং সেখানে আসনে বসিয়া নিজের নিজের গল্প করিত। বৃদ্ধ পুরুষরা বৃদ্ধা মহিলাদের সঙ্গে বসিয়া আরামে তামাক টানিত আর গল্প করিত। গরমের দিনে যেখানে সভা বসিত তাহার কিছু দূরে এক জায়গায় তামাক খাইবার জন্য আগুন জ্বালিয়া রাখা হইত। শীতের সময় কোনো গৃহস্থের ঘরের ভিতরে ধর্ম্মসভা বসিত। যাহার গৃহে

ইহারা উপস্থিত হইতেন তিনি অভ্যাগতদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য এক বোতল মদ, এক কলসী জল, চিনি এবং একখানি সুবৃহৎ আয়না, এক ঝুড়ি আতা, গাঁজর এবং পিষ্টক ইত্যাদি রাখা হইত। আতা দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া কাঁচা গোলআলু দিয়াই "দুধের সাধ ঘোলে মিটানো" হইত। গোলআলুগুলি ভালোরূপে ধুইয়া খোসা ফেলিয়া ডিশে ডিশে দেওয়া হইত। উপাসনা ও বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইভাবেই সময় কাটানো হইত। তারপর, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা আসন গ্রহণ করিলে পর, প্রচারক নিজের ওভার কোটটা খুলিয়া ফেলিতেন এবং শার্টের গলার বোতামটাও খুলিয়া দিতেন। প্রথমে সঙ্গীত, তারপর প্রার্থনা, তারপর ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ চলিত। অতঃপর যে পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর হইতে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম না পড়িত সেই পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বক্তৃতা দিতেন। সর্ব্বশেষ, দু'বাহু তুলিয়া উপরদিকে চাহিয়া গান করিতে করিতে তাঁহার কর্ম্ম শেষ করিতেন।

ধর্ম্মের জন্য এতখানি পাগল ইহারা হইয়াছিল, বোধ হয় মৃত্যুর পরে শাস্তির ভয়ে। আসল চরিত্রটা ঠিকই ছিল। ইহারা যাদু জানিত এবং উহাতে অত্যন্ত বিশ্বাসও ছিল। গো-মহিষের চিকিৎসার জন্য ওঝা ডাকা হইত। কাহারো শিকারে যাইবার সময় কুকুর পথ কাটিয়া গেলে ভয়ানক অমঙ্গল সূচনা করিত। অবশ্য, সেই ফাঁড়া কাটাইবার জন্য তাহারা দুই হাতের দুই কনিষ্ঠা অঙ্গুলীকে হুকের মত করিয়া

টানিয়া ধরিত। যাদুকরের হাতে মায়া-ছড়ি থাকিত। ঐ ছড়ির সাহায্যে উহারা নাকি, মাটীর নীচের জলের উৎস এবং ধন-রত্নের খবর বলিয়া দিতে পারিত। কেহ কখনো এসব দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ, তবে পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছিল বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিত। সেই শোনা-কথাটাই এখন বিশ্বাসের জোরে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভুত-প্রেত কাহারো উপর ভার হইলে এবং অন্যান্য ছোটখাটো অসুখ সারাইবার জন্য ওঝা ডাকা হইত। এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুকই ছিল একমাত্র উপায়। তাহারা লোকের বিশ্বাসের জোরে ব্যারাম সারাইত। চিকিৎসার সময় ঐ সকল চিকিৎসকেরা নানা রকম অদ্ভূত কাণ্ড করিত, যাহা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার ছিল। ঐ সময়ে যে সকল মন্ত্র তাহারা আওড়াইত, তার না-ছিল ভাব, না-ছিল অর্থ, এইটী ছিল আরো উপভোগের বস্তু। যদি জানালার উপর কোনো পাখী উড়িয়া আসিয়া বসিত, তাহা হইলে বাড়ীর কেহ শীঘ্র মরিবে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। শিশুর গায়ে ঘোড়ার শ্বাস লাগিলে শিশুর ঘুংনি কাশির সূচনা করিত।

একদিন যাহা এক সময় ঘটিয়াছিল তাহার কোনো অর্থ না থাকিলেও, যুগের পর যুগ ধরিয়া সেইটী ঠিক ঐ সময়েই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষে আলু-মূলা ইত্যাদির বীজ বপন করা হইত, এবং যে সকল বৃক্ষ ও চারাগাছ মাটীর উপরের দিকে বাড়িয়া ফলদান করে, সে সকল লাগানো হইত শুক্লপক্ষে। প্রাচীন রীতিনীতির বর্জ্জনে চন্দ্রের ক্রোধ জন্মিবার সম্ভাবনা

ছিল। চন্দ্রকে খুসী করিলে তাহার যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইবার ভরসা তাহাদের ছিল। চন্দ্রালোকে সাবান তৈরী হইত। ঐ সকল সাবান পুরুষানুক্রমে একই পদ্ধতিতে তৈরী হইত। একটী মাত্র লোক ঐ সাবান তৈরী করিত। একজনের অভাবে আর একজন ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করিত। শুক্রবারে কোনো কাজে হাত দেওয়া হইত না। সেইদিন কোনো শুভকর্ম্মে হাত দিলে তাহা ব্যর্থ হইবেই, এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

এই সকল লোকের ভিতর আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। কাজেই বাধ্য হইয়া ইহাদের আচার, পদ্ধতি, সংস্কার এবং শিক্ষাদীক্ষার সহিত আমি পরিচিত ছিলাম। এই সকল লোকের ছেলে-মেয়েরাই ছিল আমার চোপর দিনরাত সঙ্গী। বড় হইয়া ঐ সকল লোকের সঙ্গে আমি দিনরাত একত্র কাজ করিতাম, তাহাদের কথাবার্ত্তায় যোগ দিতাম, তাহাদের অভাব-অভিযোগ শুনিতাম। কাজেই, অজ্ঞ, অশিক্ষিত আমার নিকট বেশি কিছু আপনারা আশা করিতে পারেন না। ইহাদের অনেক রকম অযথা সংস্কারের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছি সত্য, কিন্তু শৈশব হইতে হাড়-মাস-রক্তের সঙ্গে যাহা মিশিয়া গিয়াছিল, তাহাকে হয়ত একেবারে ধুইয়া ফেলিতে পারি নাই। খুব হুশিয়ার লোকের পক্ষেও হয়ত তা সহজে সম্ভব হয় না। একমাত্র শিক্ষার প্রসারতার ফলেই এই সব দুর্ব্বল মনোবৃত্তি দূর হওয়া সম্ভব। আমার ভিতরে কে যেন এই সব দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আমাকে অষ্ট প্রহর

তাড়না করিত—কিন্তু আমি পথ পাইতেছিলাম না। দরিদ্র, অজ্ঞাত, অখ্যাত আমার পক্ষে এত বড় একটা বিরাট অভিযানের আয়োজন করা শক্ত ছিল সত্য, কিন্তু তার প্রয়োজনটা আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছিলাম। দিনের পর দিন প্রত্যেক মজলিসে, গল্পে-গুজবে, হাসি-তামাসায়, অজ্ঞতার, অশিক্ষার এবং কুশিক্ষার ভাবগুলি, আমার সামনে যেন বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইতেছিল।

৫

আমি এ পর্য্যন্ত হাসির গান ও কবিতা আবৃত্তি করিয়াছি, এবং খান কতক প্রীতি-উপহার ও গোটা কয়েক কবিতা লিখিয়াই, দু'পাঁচজনের নিকট লেখাপড়া-জানা লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। ঐ সব বাদে আর যাহা কিছু ভাবিয়াছি বা লিখিয়াছি, তাহা আর সাধারণে প্রকাশ করি নাই।

দেশের তখন কি অভাব, স্বাধীনথাকা সত্ত্বেও কোন্ অসহ্য যাতনায় সে দিবানিশি ছট্‌ফট্ করিতেছিল, নাড়ী ধরিয়া আমি তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাই আমার প্রাণ তখন পড়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। আমি যে সমাজের ভিতর ছিলাম, সে সমাজের তখন হাসি-তামাসার বেশি আর কিছু হজম করিবার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই, ইহাদের হাল্‌কা মনের খোরাকের জন্যও ভাবিতাম, আবার আসল জিনিষ যা, তার কতক আমার মস্তিষ্কে আর কতক আল্‌গা কাগজের নোট বইয়ের পাতায় পাতায় সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিলাম।

নিজে কিনিয়া বই পড়িবার সামর্থ্য আমার ছিল না। কাজেই পরের বইয়ের উপরই আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে জীবনভর। কোনো বইয়ের কোনো পছন্দসই জায়গা পাইলে,

ভবিষ্যতে বই না-পাওয়ার ভাবনায়, টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া রাখিতাম। কাগজের অভাবে অনেক সময়ে আগে তক্তার উপর লিখিয়া রাখিতাম, পরে কাগজে তুলিয়া লইতাম। আমার স্মরণশক্তি যদিও প্রখর ছিল, তথাপি আমাকে খোঁড়া-করার জন্য কোনো লোকের পক্ষে ঐ আল্‌গা পাতার নোট বইখানিই যথেষ্ট হইত। এই নোট বই না থাকিলে ভবিষ্যৎ জীবনে আমার কাজ করার পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা হইত। আমার নিকট নোট বইখানি ছিল অন্ধের যষ্ঠির মতো।

এই সময়ে বইয়ের এলাকার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হয়। প্রতিদিন জগতের হাব-ভাব, চিন্তা এবং কর্ম্মের যে সকল গ্রহণ-বর্জ্জন চলিতেছে, তাহার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে সংবাদ-পত্রের সাহায্য লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের বাড়ী হইতে মাইল দেড়েক দূরে শ্রীযুক্ত উইলিয়াম উড্ বাস করিতেন। তাঁহার নিকট যাইয়া একটা চাক্‌রী লইলাম। আগে সেখানে কাজ করিয়াছি পয়সার জন্য, কিন্তু এবারে আমার আর পয়সার গরজ ছিল না। এবারে মজুরীর পয়সা ছিল আমার নিকট 'চৌদ্দ আনা'র সামিল। কারণ, মিঃ উড্ দুইখানি মাসিক কাগজের গ্রাহক ছিলেন। ঐ দুইখানি কাগজ-পড়ার লোভটাই ছিল আমার প্রবল। আমাদের অঞ্চলে আমার জানাশুনার ভিতর বিদ্যার চর্চ্চাটা করিতেন একমাত্র তিনিই। চাক্‌রী পাওয়ার পর তাঁহার বাড়ীতে অষ্টপ্রহর থাকিতে হইত, কাজেই কাগজ দুইখানা পড়ার সুযোগ পাইলাম

যথেষ্ট। কাগজ দুইখানির একখানি ছিল, মদ্যপান-নিবারণী-সমিতির মুখপত্র। রাজনীতি সম্বন্ধীয় কাগজখানার চেয়ে এই কাগজখানাই আমার বেশি ভালো লাগিত। এই রকম একখানা কাগজ যে বাহির হইতেছিল, তাহা জানার সুযোগ আমার এতদিন হয় নাই। এই কাগজের প্রত্যেকটী শব্দ ধ্রুব সত্য বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল।

আমি জীবনে কোনোদিন মদ ছুঁই নাই। আমার ধারণা হইয়াছিল, যাহারা মদ খায় তাহারা মানুষ না হইলে মদের প্রচলন বন্ধ হওয়া অসম্ভব। আমার মদ না-খাওয়ার জন্য মা যথেষ্ট গৌরব বোধ করিতেন। মদের আড়তে কাজ করিয়াও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমিও নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিয়াছিলাম।

মদ্যপানের কুফল আলোচনা করিতে করিতে একটা প্রবন্ধ রচনা করিয়া একদিন মিঃ উডকে দেখিতে দিলাম। আমার রচনা জানিয়া তিনি খুবই খুসী হইলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলাম। উড্ মহাশয় লেখাটী পড়িয়া ধারে-কাছে শিক্ষিত লোক যাহাকে পাইয়াছিলেন, তাহাকেই এই খবরটা দিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারই চেষ্টায় প্রবন্ধটী মদ্যপান-নিবারণী-সমিতির মুখপত্র "টেম্পারেন্স"এ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি ছাপার হরপে ছাপানো আমার প্রবন্ধটা দেখিয়া যারপরনাই খুসী হইয়াছিলাম। বাড়ীতে লইয়া গেলে প্রবন্ধটী দেখিয়া আমার চেয়ে শতগুণ খুসী

হইয়াছিলেন আমার মা। দেশের এই শ্রেষ্ঠ কাগজে, দেশের নামজাদা এবং চিন্তাশীল লোকেরাই যে লিখিয়া থাকেন, মা তাহা জানিতেন। ঐ সকল লোকেরাই যে আবার এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, তাহাও মা-র জানা ছিল। তাঁহারা আমাকে এতটা সম্মান দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাগজে আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া—সেই জন্যই মা-র গর্ব্ব হইয়াছিল বেশি। এমন অবস্থায় যে কোনো লোকেরই গর্ব্ব হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আমার মতো নগণ্য পাড়া-গেঁয়ে মজুর-চাষার পক্ষে তো বটেই। প্রতিবেশীরা আমার প্রবন্ধ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। এই রকম একটা প্রবন্ধ পড়িবার জন্য তাহারা কখনো আগ্রহ প্রকাশ করিত না নিশ্চয়ই। তাহাদের একজন প্রতিবেশী যে একটা কিছু লিখিয়াছে, এবং শহরের কাগজে তাহা ছাপা হইয়াছে, টানাটানির আসল কারণটা ছিল উহাই।

অতঃপর মিঃ উডের ইচ্ছামতো রাজনীতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিলাম। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রাজনীতিক কোনো লেখা, কাগজে প্রকাশিত হয়। সপ্তাহ খানেক পর, একটী প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। আমেরিকার শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধটী রচিত হইয়াছিল। লেখা পড়িয়া উড্ মহাশয় খুব খুসী হইলেন। মিঃ উডের চেষ্টায় এই প্রবন্ধটীও একখানি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহার কতখানি আনন্দ হইয়াছিল তাহা আজ বুঝিতে পারিতেছি। আমার মাতাপিতা

এবং প্রতিবেশীরা সেদিন এক নবযুগের নূতন দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ, আমার সেই আল্গা কাগজের নোট বইয়ের এক একটা লাইনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার অন্তরাত্মার তাড়নায় আমি এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছিলাম না। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার জন্য আমি পাগল হইয়া উঠিতেছিলাম। উড্ মহাশয়ের বাড়ীতে আমার যে প্রয়োজন ছিল তাহা শেষ হইয়া গেল। এবারে আর এক নূতন ফিকিরে রহিলাম। জুতা-সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সকল কাজে আমি অভ্যস্ত ছিলাম বলিয়া, মনিবরা যেমন আমাকে খুঁজিতেন, ইহাদের চাক্‌রী করিয়া আমারও তেমনি কম লাভ হয় নাই। এই চাক্‌রীর মারফতেই আমি বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার উপর আমার মনিবের যথেষ্ট বিশ্বাস এবং ভরসা ছিল, তথাপি নিউ অরলিন্‌স্ পর্য্যন্ত তাহার মালের নৌকা চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিব কিনা, জানিতে চাহিলেন। তাহার নিকট শুনিলাম, নিউ অরলিন্‌স্ সেখান হইতে ১৮০০ মাইল দূর। আমি বলিলাম, আমার পিতার অমতে যাইতে পারিবনা। বেশি বেতন দিলে আমার পিতার কোনো আপত্তি থাকিবেনা, বলিয়াই, একেবারে ২৫৲ টাকা বেতনে আমাকে বহাল করিয়া ফেলিলেন, এবং সেখান হইতে ফিরিবার কালে জাহাজ ভাড়াও দিতে রাজি হইলেন। আমি তৈরী হইলেই নৌকা ছাড়া হইবে, জানিলাম।

বাড়ী যাইয়া চাক্‌রীর কথাটা পাড়িতেই আমার পিতা রাজি হইলেন, কিন্তু মা এত দূরে, বিশেষতঃ এক অজানা দেশে বিপদের মাঝে, আমাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। মাকে অনেক রকমে বুঝাইলাম। যাহা দেখি নাই, তাহা দেখিতে পারিব বলিয়া ভরসা দিলাম। মা বলিলেন, "অনেক কিছু দেখিবে তা সত্য, তবে মিসিসিপির একেবারে তলায় গিয়া।" আমার সাহস সম্বন্ধেও মাকে অনেক কিছু শুনাইলাম। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পক্ষে যত রকম কৌশল তখন মনে পড়িল, তাহার সকলগুলিই একে একে প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু মা-র তখন গম্ভীর মূর্ত্তি। মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বাহির হইতেছিল। আমার কথায় বাধা দিয়া মা বলিলেন, "ওসব বাহাদুরীর কথা আমার ঢের ঢের জানা আছে। তোমাকে আমি যাইতে দিব না।" শেষ পর্য্যন্ত গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া মাকে খুসী করিয়া যাওয়ার ফিকির খুঁজিতে লাগিলাম; বলিলাম, "মা, তুমি যদি যাইতে না দাও, আমি যাইব না।" সত্য সত্যই, মা-র এই চরম অনিচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার মতো শক্তি আমার তখন ছিল না। মাতৃ-হৃদয় এক অদ্ভুত পদার্থে তৈরী—বজ্রের মতো কঠোর, আবার ফুলের মতো কোমল। হঠাৎ একটু নরম হইয়া মা যা বলিলেন, তাহাতে অনেকখানি ভরসা পাইলাম। এই ভ্রমণে আমার যে শিখিবার আছে অনেকখানি, মা তাহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু বিপদের কথা ভাবিয়াই আমাকে যাইতে দিতে রাজি ছিলেন না।

আমি আবার সুযোগ মতো যতটা সম্ভব বলিলাম, কিন্তু শেষ জবাব পাইলাম—“আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না বাপু।” বুঝিলাম, নিউ অরলিন্‌স যাওয়া আমার এইখানেই শেষ।

নৌকায় মাল বোঝাই হইতে লাগিল। আমি পারে দাঁড়াইয়া দেখিতাম। এক একটা বোঝা নৌকায় উঠিতেছিল, আর সেই সঙ্গে আমার প্রবল আগ্রহকেও যেন একটু একটু করিয়া নৌকায় তুলিয়া দিতেছিলাম। নৌকায় মাল বোঝাই হইয়া গেল। এমন সময়ে হঠাৎ মা-র পূর্ণ সম্মতি পাইয়া গেলাম। কেন পাইলাম, কেমন করিয়া পাইলাম, তাহা ভাবিবার দরকার মনে করি নাই। মা-র হুকুম পাইয়াই আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘাটে আসিয়া দেখি সব ঠিক। মনিব-পুত্র এলেন এবং আমি “জয় দুর্গা” বলিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। পারে যাহারা ছিল তাহারা ভাবিতেছিল, আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিয়াই মরিতে যাইতেছি। তাহাদিগকে হাবভাবে, আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলাম, নিউ অরলিন্‌সে না-গেলেও, ওসব আমার জানা আছে, ভয়-ভাবনা আমার নাই। দুই-দশবার যাতায়াতে যে সাহস হয়, আমি তখনই তার পরিচয় দিতে কসুর করিলাম না। তাহারা আমার জীবনের মায়া করিতেছিল, কিন্তু আমি চাহিয়াছিলাম, বাঁচিতে হইলে বাঁচার মতো বাঁচাই দরকার। আমি জীবনটাকে ভালো-রূপে ছানিয়া বুঝিতে চাহিয়াছিলাম, আমার বাঁচিয়া থাকার

প্রয়োজন কতটুকু। ইণ্ডিয়ানার পল্লীভবন হইতে মিসিসিপির মুখ বেশি দূর এবং তরঙ্গময়, না, ওয়াশিংটনের দরবার বেশি দূর এবং বিপদসঙ্কুল, ইহা মাপিবার এবং বুঝিবার জন্যই আমি এই ভ্রমণ সুরু করিয়াছিলাম। জীবন-গঠনের কোনো দিকেই যাহাতে ফাঁক না থাকে, ইহাই ছিল আমার প্রবল এবং আন্তরিক ইচ্ছা। আমি জানিতাম, ভয় তাহাদের মৃত্যু তাহাদেরই জন্য, যাহারা দিবারাত্র মৃত্যুর ধ্যান এবং মৃত্যুর জপ করিতেছে। যে জীবনের আরাধনা করে, জীবনের নব নব সঙ্গীত শুনিতে ব্যাকুল, সে জীবনই লাভ করিয়া থাকে। আমি সেদিন নবজগতের নূতন দৃশ্য দেখিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা বুঝিবার লোক সেখানে ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে আমি আর একবার নিউ অরলিন্‌সে গিয়াছিলাম। পিতাকে সাংসারিক ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই তখন বাহির হইয়াছিলাম। অনেক সাধ্য-সাধনার পর মা-র অনুমতি লইয়া নিজেই একখানা ডিঙ্গী নৌকা তৈরী করিয়া ফেলিলাম। তারপর, একদিন একখানা কম্বলের পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া নিউ অরলিন্‌সের দিকে নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলির উপর জাহাজ-ঘাটে তখন কোনো জেটী ছিল না, কাজেই লোক উঠা-নামার পক্ষে ঐ সকল স্থানে ডিঙ্গী নৌকা ছাড়া আর অন্য গতি ছিল না।

জাহাজ-ঘাটের ধারে নৌকাখানা বাঁধিয়া আশা-নিরাশার অনেক কথাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে, বিছানাপত্র এবং ট্রাঙ্ক

লইয়া দুইজন লোক পারে আসিল। একে একে সকল নৌকা দেখিয়া তাহারা শেষে আমার নৌকাখানাই পছন্দ করিল। তাহারা আমার নৌকায় উঠিয়া ট্রাঙ্কের উপর বসিল। আমি নৌকা জাহাজের ধারে লইয়া গেলাম। আমার ভাড়াটিয়ারা জাহাজে চড়িল, আমি একে একে তাহাদের ট্রাঙ্কগুলি জাহাজের ডেকে তুলিয়া দিলাম। বোধ হয়, ভুলবশতঃই তাহাদের আমাকে ভাড়া দেওয়ার কথা মনে ছিল না। জাহাজ ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় আমি ডাক দিতেই তাহারা দুইজনে নিজ নিজ পকেট হইতে এক একটী রূপার চাক্‌তি আমার নৌকায় ফেলিয়া দিল। দুইটীর দাম একুণে তিন টাকা দুই আনা। আমি হাতে লইয়াও ঐ চাক্‌তি দুইটী ঠিক কিনা, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিকট চির-দিনই হয়ত এই রকম শত শত রূপার চাক্‌তি নগণ্য, আজ আর আমার কাছেও হয়ত ইহার তেমন মূল্য নাই, কিন্তু যেদিন আমি ঐ চাক্‌তি দুইটী রোজগার করিয়াছিলাম সেদিনটী আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। আমি নিজের পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়াছিলাম বলিয়াই এতটা আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমি দরিদ্র বলিয়াই, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সমস্ত জগৎটা আমার কাছে ক্রমেই বিশাল এবং সুন্দর বোধ হইতেছিল। সেই মুহূর্ত্তেই আমি আমার নিজের সম্বন্ধে নিজের আশা ও বিশ্বাসকে ভরসা দিতে পারিয়াছিলাম।

সে সময়ে বড় বড় নদীতে এই রকম অভিযানের কালে

প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন নৌকার মাঝিদের পরস্পরের ভিতর মারামারি হইত, বিপদও ঘটিত যথেষ্ট। ইহারা যেমন ছিল অশিক্ষিত, তেমনি ছিল বর্ব্বর। চরিত্র বলিয়া কোনো বস্তুর ধার ইহারা ধারিত না। ইহারা দেহের পুষ্টি ও পেটের তৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছিল। পুরুষানুক্রমে এই শিক্ষাই ইহারা পাইয়া আসিতেছিল। ইহাদের আত্মসম্মানবোধ ছিল না, কিন্তু আত্ম-অহঙ্কারটা ছিল পুরামাত্রায়। কথায় কথায় শপথ, কুৎসিত আলাপ, কুৎসিত গান ইত্যাদি ছিল যেমন ইহাদের মনের খাদ্য, মদ্যপান প্রভৃতি দেহের খাদ্যও ছিল তদ্রূপ। ইহারা নির্ভীক, দিলদরিয়া এবং পরিশ্রমী ছিল। পয়সা রোজগার করিত যথেষ্ট, পয়সার অপব্যয়ও ছিল যথেষ্ট। তাহারা জীবনের কোনো পরোয়া না করিয়া, বড় বড় জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত সুদীর্ঘ নদী বাহিয়া, খোস মেজাজে দিনের পর দিন চলিতে থাকিত। ইহাদের এইরূপ যাতায়াতের ফলে দেশের এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের যোগাযোগ পাকিয়া উঠিতেছিল। তাহারা যে কোনো সময়ে বিপদের সামনে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিত। প্রকৃতির যে কোনো অবস্থায় ইহারা অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারিত। এই সকল মাঝিমাল্লারা বড় বড় নৌকার পাটাতনের উপর শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিত। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস বিছানার ভিতর একমাত্র কম্বলই ছিল তাহাদের সম্বল। এইরূপে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাহারা সরল সহজ ভাবে কাটাইয়া দেয়।

এক একখানা বড় বড় মালের নৌকায় যথেষ্ট পরিমাণ মাল বোঝাই করিয়া ইহারা মিসিসিপির উজানে চলিতে থাকিত। নিজেদের শক্তি অসীম ভাবিয়াই, এই সকল মাঝিমাল্লারা স্রোতের প্রতিকূলে প্রায় দুই হাজার মাইল পাড়ি দিবার জন্য সর্ব্বদাই তৈরী থাকিত। এই রকম অভিযানের সফলতা নির্ভর করিত, চরম শারীরিক বল, অসীম জেদ আর কর্ম্মকুশলতার উপর। বংশানুক্রমে এই সকল গুণ লইয়া এক শ্রেণীর লোক গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহারা ঝঞ্ঝার বজ্রমুষ্টি বুক পাতিয়া লইয়া এবং নানা রকমের কঠোরতা সহ্য করিয়া, পুরুষানুক্রমে একটা গর্ব্ব করিবার মতো কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইত।

এই সকল মাঝি-মাল্লা ব্যতীত সওদাগর-ব্যবসাদাররাও নিউ অরলিন্‌সে মাল কেনা-বেচা করিত। কখনো জন কতক ব্যবসাদার একত্র হইয়া, কখনো বা কেহ এক্‌লাই সেখানে মাল পাঠাইয়া দিত। আমার মনিবের অনেক মাল থাকায়, তিনি একাই একখানি নৌকা ভাড়া করিলেন। এই মাল লুশিয়ানার আখের আবাদে পাঠানো হইয়াছিল। উদ্দেশ্য নগদ টাকা। টাকার মুখদর্শন আমাদের অঞ্চলে অসম্ভব ছিল বলিলে হয়ত অতিরিক্ত কিছুই বলা হইবে না। আমাদের পরিবারের মতো অনেক পরিবারই পরের ঘরে টাকার রূপ দর্শন করিয়া চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে পশ্চিমাঞ্চলের ধনীরা পূর্ব্বাঞ্চলের হাটে বাজারে গঞ্জে মাল বিক্রয় করিয়া অর্থাভাব দূর করিতেছিলেন। কিন্তু গরীব

গরীবই ছিল। ধনীর দুয়ারে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিন-মজুরীটা পাইতে অবশ্য তাহার কোনো দিন কোনো অসুবিধা হয় নাই।

এতক্ষণ আমরা দেশ-গাঁ ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। এ পর্য্যন্ত অনেক কিছুই ঘটিয়াছে, তা আর বলিবার দরকার নাই। সন্ধ্যা হইয়া গেলে কোনো নিরাপদ স্থানে রাত্রি কাটাইবার জন্য নৌকা লাগাইতাম। মাঝিমাল্লারা বিছানা ব্যবহার করিত না—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরাও মাঝিমাল্লা, কাজেই, কম্বল ছাড়া আমাদেরও আর কোনো বিছানা ছিল না। মাঝিমাল্লাদের জীবন অসীম। নিতান্ত অবনত অবস্থার ভিতরেও তাহাদের তৃপ্তি অনেকখানি। তাহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রবল নহে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহারা আর কিছুই চাহে না। নিজেদের অজ্ঞাতে—পয়সার জন্য, ক্ষুধা শান্ত করিবার জন্য, মনের তৃপ্তির জন্য, রৌদ্র-বৃষ্টি-শিশিরকে অকাতরে হজম করিয়া, কঠোরতাকে অন্তরে বাহিরে বরণ করিয়া লইয়া যেভাবে ইহারা গড়িয়া উঠে, একটা জাতির গৌরবের পক্ষে, মানব-সমাজের মঙ্গলের পক্ষে, ইহার দাম অনেক বেশি। মাঝিমাল্লা-নাবিক-সৈনিক ইহারা দুঃখ-দেবতার আনন্দঘন মূর্ত্তি। আমরা সকল রকম অবস্থাকেই জয় করিয়া চলিতেছিলাম। নীরব দেশের এই বিরাট নির্জ্জনতার ভিতরেও আমরা বেশ আরামে দিনগুলি কাটাইয়া দিয়াছি। আমাদের নৌকায় আমরা দুইটী প্রাণী ছিলাম বটে, কিন্তু অন্যান্য নৌকার মাঝিদের উল্লাস আমরাও উপভোগ করিয়াছি।

নদীর ধারে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে আমি চলিতেছিলাম। এক রশি যাইতে না যাইতেই, "কোথায় যাইতেছ, কি মাল, কার নৌকা" ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিয়া দিয়া আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। সময়ে সময়ে প্রবল ঝড় আসিয়া আমাদের নৌকাখানিকে তোলাপাড়া করিতেছিল। অত্যাচারের সুযোগ বুঝিয়া সেই দুর্দ্দিনে বৃষ্টিও দেখা দিল। কিন্তু আমাদের চলা কখনো বন্ধ হয় নাই। একে সকল নদীর গৌরব মিসিসিপির বুকে আমরা উজান চলিতেছিলাম, তার উপর আবার কোনো কোনোদিন রাত্রিতে "প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে, মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে" আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু আমি এই অবস্থায় পড়িয়া মোটেই ভাবিত হই নাই; বরং আরামই বোধ করিতেছিলাম। হয় জীবন, নয় মৃত্যু—ভাবিবার কি আছে! রফা করিয়া চলার পক্ষপাতী আমি কোনোদিনই নই।

এক রাত্রিতে যখন আমরা ঘুমাইতেছিলাম তখন নিকটবর্ত্তী আবাদের একদল নিগ্রো, লুঠ করিবার জন্য আমাদের নৌকায় উঠে। আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা অনেক ভয় দেখাইলাম। এই কর্ম্ম করিয়া করিয়া ইহারা হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই এক পা-ও পিছু হটিল না। শ্বেতাঙ্গ মনিবদের জন্যই ইহারা এসব কাজ করিত। মনিবরা 'বাল্যশিক্ষা' এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যার ফলে পুরুষানুক্রমে গোলামী-

করাটাই যে একমাত্র ধর্ম্ম, ইহারা তাহাই শিখিত, জানিত এবং বুঝিত। মানুষ বলিয়া কোনো বোধ ইহাদের চিন্তার 'চৌহদ্দি'র মধ্যে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার সকল ব্যবস্থা মনিবরা পাকাপাকি ভাবেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। দিনের বেলায় আবাদে খাটিয়াও ইহারা গোলামী শেষ করিতে পারিত না, রাত্রির জন্যও কিছু কিছু জমা থাকিত। মনিবের ধর্ম্মই ছিল ইহাদের ধর্ম্ম। একই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া মনিব সাজিয়াছিলেন, অত্যাচারী ও ভক্ষক, আর গোলাম সাজিয়াছিল বিনয়ী ও ভক্ষ্য। একজন অষ্টপ্রহর ডাণ্ডা মারিবার জন্য তৈরী. আর একজন নিয়তির বিধান জানিয়া তাহাতে নিরপেক্ষ। গোলামের গোলামীকে একটা দিনের জন্য একটু কমি করিয়া বিদ্রোহ করিবার একটু চিন্তা, কি সাহস ইহারা মনেও আনিতে পারে নাই। দুশ্চরিত্র অধঃপতিত মনিবদের শৌর্য্যবীর্য্যই ছিল ইহাদের এই সকল দুষ্কর্ম্মের শক্তি।

আমরা আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াইলাম। উভয় পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে শক্তি আমাদের উপর তাহারা প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই শক্তি, ৪০ লক্ষ নিগ্রো সমবেতভাবে একদিন, এক মুহূর্ত্ত চালাইলে শ্বেতাঙ্গের স্থানে নিজেরাই মনিব হইয়া বসিতে পারিত। নৌকার পাটাতনের উপর উভয় পক্ষের রক্ত এক হইয়া চারিদিকে গড়াইতে লাগিল। দশ পোনের মিনিট এই ভাবে ভীষণ হাতাহাতির পর, আমি উহাদের একটীকে জলে ছুড়িয়া ফেলিতেই, বাকি কয়টি নৌকা হইতে লাফাইয়া

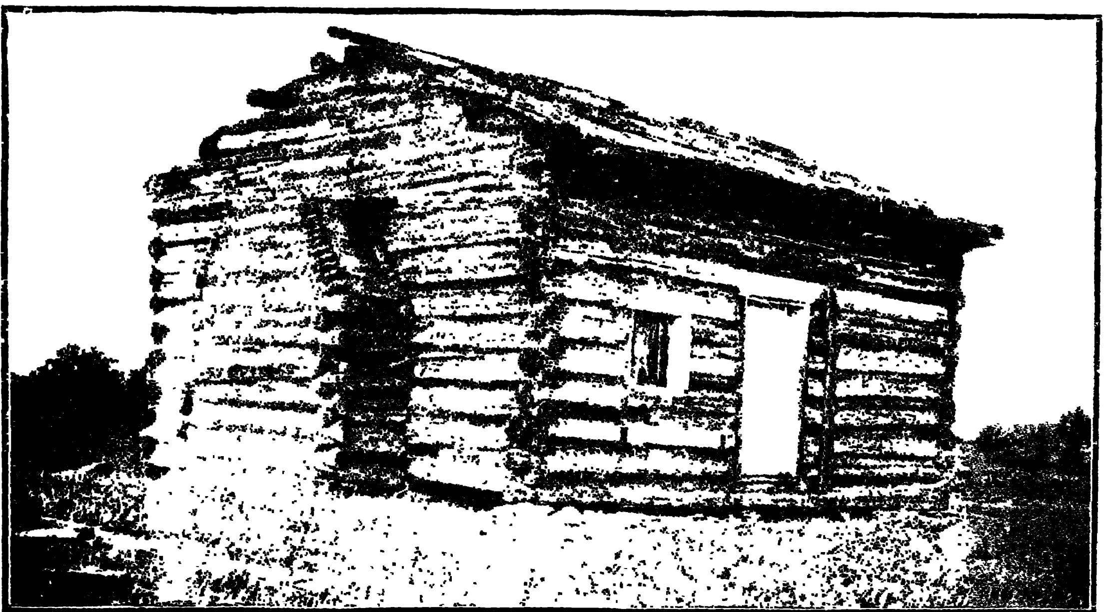
পড়িল। আমরাও জয়লাভটা ভালোরূপে উহাদের অন্তরে আঁকিয়া দিবার জন্য আধ মাইল পর্য্যন্ত উহাদিগকে তাড়াইয়া চলিলাম। জীবনে আর কখনো বোধ হয় ইহারা এমন শিক্ষা পায় নাই। আমার ডান চোখের উপরে একটা ঘা পাইয়াছিলাম। এই দাগটি আমার সেইদিনের স্মৃতি। আমরা নৌকায় আসিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিগ্রোদের উপর আমার কোনো রাগ হয় নাই। মনুষ্যত্বহীন ইহাদের জন্য, সত্য সত্যই, আমি অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছিলাম।

অতঃপর নিউ অরলিন্‌সে মাল পৌঁছাইয়া দিয়া মনিবের বন্দোবস্ত মতো জাহাজে চড়িয়া বাড়ী ফিরিলাম।

৬

বহুদিন হইতে আমার মা-র ইচ্ছা ছিল আমাদের একখানি সুন্দর ঘর হয়। নিউ অরলিন্‌স্ হইতে ফিরিবার পর, হাতে আর কোনো কাজ না থাকায় ঘরের জন্য গাছ কাটিয়া তক্তা-চিরিতে লাগিয়া গেলাম। এই সময়ে এক জনের নিকট ইণ্ডিয়ানার রাষ্ট্রীয় আইন সম্বন্ধে একখানা বইয়ের সন্ধান পাইলাম। বই-খানি আনিয়া দিবারাত্র উহাই পড়িতে লাগিলাম। তখন এই সকল বই পড়িয়াই আমি বেশি আনন্দ পাইতাম। এই বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতে যাইয়া মোকদ্দমা দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনো আদালত-ঘরের চৌকাঠ মাড় ই নাই। উকীল-বারিষ্টাররা তাহাদের মক্কেলদের জিতাইবার জন্য কি রকম লড়ে, তাহা একবার নিজের চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা হইল: মাইল পোনের দূরে বুনেভিলার আদালতের উদ্দেশে একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় অসুবিধা জুটিয়াছিল যথেষ্ট, কিন্তু নানা রকম নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং আদালতের মোকদ্দমার কথা চিন্তা করিয়া করিয়া আমার সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আদালতে হাজির হইয়া দেখিলাম, শহরের এক নামজাদা উকীল এক খুনী -মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষ সমর্থন



এই লগ ক্যাবিনই লিঙ্কল্‌নের জন্মগৃহ।

করিতেছেন। তাঁহার নাম জন্‌ ব্রেকিন্‌রীজ। তাঁহার বাগ্মীতা এবং বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, ঐ বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমি একাদিক্রমে এক সপ্তাহ এক জায়গায় বসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিতাম। সেদিন আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম, যদি এই রকম বক্তা হইতে পারি তবে জীবনে আর কিছুই চাহিব না। বক্তৃতা শুনিয়া আমি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আদালতের ছুটির পর ব্রেকিন্‌রীজ মহাশয়ের নিকট যাইয়া বলিলাম, মহাশয়, এ পর্য্যন্ত এ রকম বক্তৃতা আর শুনি নাই!

বোধ হয়, আমার এই মন্তব্যে তিনি খুব বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়াছিলেন। তা হইবারই কথা। শহরের এক নাম-জাদা উকীলের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আমার মতো এক অজ্ঞাত-কুলশীল এবং নিতান্ত দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে এত বড় একটা মত জাহির করা, ধৃষ্টতা ছাড়া তাঁহার আর কি মনে হইতে পারে! আমার পোষাক পাড়াগেঁয়ে ধরণের এবং জীর্ণ ছিল সত্য, কিন্তু তিনি আমার কথার একটা জবাব দিয়া তাঁহার শিক্ষার এবং শিস্টতার মর্য্যাদা বজায় রাখার কোনো দরকারই মনে করেন নাই। সেদিন আমার শুধু এই কথাই মনে হইতেছিল যে, যে সংসারে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে ধনীর নিকট কি সে চিরদিনের জন্য ঘোর পাপী বলিয়াই বিবেচিত হয়? যে আজ দরিদ্র সে যে চিরদিনের জন্য দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত হইতে থাকিবে এমন কোনো পাকাপাকি

বন্দোবস্তের কথা, কোনো স্থান হইতে ধনীর দপ্তরে পৌঁছিয়াছে কি ? দরিদ্রের ভিতরে কি কোনো সদ্‌গুণ থাকিতে পারে না ? যে দরিদ্র, ধনীর রাজ্যের কোথাও তাহার চলিবার ফিরিবার কোনো মতামত দিবার স্বাধীনতা কি তাহার নাই ? দরিদ্র বলিয়া কি গুণীর গুণ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার থাকিতে পারে না ? যে বিধাতার সৃষ্টি এই ধনী এবং দরিদ্র, তিনি কি ধনীকে সকল রকমে ধনী করিয়াই এ জগতে পাঠাইয়াছেন ? আজিকার ধনীকে যদি আজিকার দরিদ্র ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের ফলে ভবিষ্যতে কোনো দিন ঘৃণা করিবার সুযোগ পাইয়া উপেক্ষা না করে, তবে দরিদ্রের পক্ষে সেটা খুব অন্যায় হইবে কি ? এমন দিন কি আসিতে পারে না, যেদিন প্রকৃতির চক্রের ঊর্দ্ধে থাকিবে আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্ আর তাহার ঠিক নিম্নে থাকিবে জন্ ব্রেকিন্‌রীজ ?

আমার প্রতি নহে, দরিদ্রের প্রতি—ব্রেকিন্‌রীজের নহে, সমুদয় ধনীর—এই নীচ ব্যবহারে নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে অনেক আশা বুকে লইয়া সেদিন আমি পেছন ফিরিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল পরে এমন একদিন আসিয়াছিল, যেদিন ওয়াশিংটনের রাজপ্রাসাদে দারিদ্র্যের ছাপ-দেওয়া আসামী লিঙ্কল্‌নের সহিত ঐশ্বর্য্যের জয়টীকা-দেওয়া ফরিয়াদী ব্রেকিনরীজের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি জানিতে পারিয়া তখন ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি তখন আর পূর্ব্বের ব্যথার দরুণ প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছাকে মনে স্থান দিয়া দরিদ্রকে ছোট করিয়া ফেলিতে চাহি

নাই। সেই জন্যই ব্রেকিনরীজ মহাশয়কে বলিলাম, ঐ রকম বক্তৃতা আমি জীবনে আর কখনো শুনি নাই। যদি ঐ রকম একটা বক্তৃতা আমি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার খুবই আনন্দ হইত।

দরিদ্রের আর ধনীর, কৃষ্ণাঙ্গের আর শ্বেতাঙ্গের, গোলামের আর মনিবের, পরাধীনের আর স্বাধীনের জন্য, আমি চিরদিন এক উপায় চাহিয়া আসিয়াছি। ইহাদের সকলের চলিবার জন্য এক পথ, দাঁড়াইবার জন্য এক উপায়, ভাবিবার জন্য এক স্বার্থ, মিলনের জন্য এক আদর্শ আমি চিন্তা করিয়াছি। পতিতের, নির্য্যাতিতের অন্তরের ব্যথার নব নব সঙ্গীত শুনাইবার জন্যই আমি জগৎ-সভার সামনে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলাম। আমার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে কিনা জানি না, তবে আমি এখনো আমার সাধনা ত্যাগ করি নাই।

বুনেভিলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর নিকটেই একস্থানে একটা আলোচনা-সভা গড়িয়া তুলিলাম। সেখানে প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতাদান, অথবা কোনো বিষয় সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক চলিত।

একদিন আলোচনা-সভায় এক প্রশ্ন উঠিল, "কার দাবী বলবৎ হওয়া উচিৎ—কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোর, না, লোহিতবর্ণ ইণ্ডিয়ানের ?" আমি সেদিন যে কারণেই হোক কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোর জন্যই লড়িয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই দাসজাতির মুক্তির জন্য বাহিরে প্রচার করিতে লাগিলাম। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমার চোখ-মুখ-নাক-কান সকল দিকে উৎসুক হইয়া,

উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য পথ খুঁজিতেছিল। আমি সকল সময়ই যেন শুনিতাম—"মানুষের মুক্তি নিয়ে এসো"।

আমার জননীর মৃত্যুর পর হইতেই আমার পিতার ইণ্ডিয়ানার বাড়ী ছাড়ার বিশেষ ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল ১৮৩০ সাল দেখা দিবার পূর্ব্বেই। ইলিনয়ে আমাদের পরিচিত দুই চারি ঘর লোক আসিয়াছিলেন, কাজেই, সেইখানে যাওয়াই স্থির হইল।

চারি জোড়া বলদের গাড়ীতে সমুদয় মালপত্র উঠানো হইল। বেশির ভাগ মাল চলিল আমার সঙ্গে। দিবারাত্র গাড়ী চালাইয়া যথাসময়ে আমরা ইলিনয়ে পৌঁছিলাম। বাড়ীর জন্য জায়গা ঠিক হইল সান্‌গামোন নদীর পারে। এই স্থানটীর পেছনে বাহাদুরী গাছের বিরাট জঙ্গল, আর সাম্‌নে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। মাঠের উপর 'ছণ' জাতীয় এক রকম তৃণ যখন বাতাসে দুলিতে থাকিত দেখিতাম, তখন আমাদের খুব আনন্দ হইত।

সেদিনে গাছের গুঁড়ি দিয়া আমেরিকান জঙ্গলের বাসিন্দারা যে প্রণালীতে 'লগ কেবিন' তৈরী করিত, আমাদের কেবিনের তৈরীর পদ্ধতিও ছিল ঠিক সেই রকমেরই। তবে উহাতে যতটা সৌন্দর্য্য আনা সম্ভব ততটা আনিয়াছিলাম। অন্য লোকের পরামর্শ শুনিতে আমার কোনোদিন কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু কার্য্যকালে যেটা ভালো মনে হয় আমি তাহাই করি। সৌন্দর্য্য বিষয়ে আমার মা-র চেয়ে ভালো জ্ঞান আর কেহ আমাকে

দিতে পারেন নাই। আমরা সকলেই জঙ্গলী সন্দেহ নাই, কিন্তু মা-র চোখ দুইটী যেন কোনো বিশেষ উপাদানে তৈরী। আমি অনেক সময়ে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার চোখ দুইটী বিশ্ব সৌন্দর্য্যকে কতকাংশে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

এইস্থানে বসবাস করিবার মাস ছয়েক পর ভীষণ ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল। আমার শরীরের মতো সুদৃঢ় শরীরও যখন উহার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে কাবু হইয়া গেল, তখন আমার পিতা আবার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেন। ব্যাধি আর মৃত্যু নাই কোথায়, তথাপি দুর্ব্বল মানুষ বাঁচিবার জন্য কত বৃথা চেষ্টাই না করে! কোনো প্রয়োজনের জন্য বাঁচিয়া থাকার চেয়ে, শুধু ভোগ-সুখের লোভেই সংসারের অধিকাংশ লোক বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সেদিনে ডাক্তার কবিরাজ তো দূরের কথা, এমন কি, এক-আধজন হাতুড়েও দেখা যাইত না। কাজেই, এইভাবে ঠাঁই নাড়া করিয়াই গৃহস্থরা চিকিৎসার অভাব মিটাইতেন। ইণ্ডিয়ানা ছাড়িয়া ইলিনয়ে গিয়াও সুখ পাইলাম না। "অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।" আবার এ জায়গা ছাড়িয়া আর এক নূতন জায়গার জন্য তল্পীতল্পা গুটাইতে হইল। যাহা হোক, অতঃপর আর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। এইখানেই ১৮৫১ সালে আমার পিতার মৃত্যু হয়।

নূতন বাড়ীতে বৎসর খানেক বাস করার পর এক মাঝিগিরি জুটিয়া গেল। আবার আমাকে নিউ অরলিন্স্ যাইতে হইবে

শুনিয়া আমি যারপরনাই খুসী হইলাম। নিউ অরলিন্‌স্ মিসিসিপির পতন-মুখে অবস্থিত ছিল বলিয়া একাজে সকলে পা বাড়াইতে সাহস করিত না। আমি পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার জোরে কাজটী গ্রহণ করিলাম। মাঝিমাল্লা সর্ব্বসমেত আমরা তিনজন ছিলাম—আমি, আমার ভাই জনষ্টন এবং আর একটি ছেলে। চুক্তি হইল, নৌকার মালিক আমাদের তিনজনকে একুণে দৈনিক ১৷৵০ আনা হিসাবে দিবেন। মাল পৌঁছাইয়া দিবার পর অবশিষ্ট ১৮৭৷৷০ টাকা দিয়া হিসাব মিটাইয়া দিবেন।

নিউ সালেমের ডেন্‌টন্ অফ্‌কাট্ একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। ব্যবসাই তাহার উপজীবিকা। লোকটী যে মন্দ ছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ আমি পাই নাই। আমি এই চুক্তির ব্যাপারে লোকটীকে খুব উদার বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলাম। লোকে বলিত লোকটা বেজায় স্বার্থপর এবং নিজের স্বার্থের বেলায় তাহার এই রকম উদারতা লোকপ্রসিদ্ধ। আমি এই মতামতের ধার ধারিবার কোনো প্রয়োজন মনে করি নাই। আমি কাজ করিয়া মজুরী পাইব, তাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত।

অতঃপর অফ্‌কাটের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রওনা হইলাম। হয়ত লোকে মনে মনে ভাবিত আমার চেহারাটা তেমন সুন্দর নয়, আমারও কতকটা সেই ধারণাই ছিল। তথাপি কাহারো চেহারাটা একেবারে খারাপ, এটা কেহ ভাবিতে চায় না, শুনিতেও ভালোবাসে না। অফ্‌কাট

মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কালে তিনি আমার দিকে যেভাবে তাকাইয়াছিলেন, তাহাতে অপরে কি ভাবিত জানি না, কিন্তু আমি আসল বস্তুটা বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম। তিনি এমন একটা কোনো অসম্ভব বস্তুর সাম্‌নাসাম্‌নি পড়িয়া গিয়াছিলেন, যাহার সম্বন্ধে তাহার ইতিপূর্ব্বে ধারণা করার কোনো কারণ জন্মে নাই। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই সাধারণ মানুষের চেয়ে অদ্ভুত মনে করিয়া আমাকে দেও-দৈত্য ঠাওরাইয়াছিল। অফ্‌কাট মহাশয়ও বোধ হয়, সেই রকমই একটা কিছু ধারণা করিয়াছিলেন।

মাল বহিবার জন্য একখানি নৌকা ইতিপূর্ব্বেই পৌঁছিবার কথা ছিল। তাহা না-আসায় তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই, নূতন বন্দোবস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত আরো কিছুদিন আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি তাহাকে একখানি নৌকা তৈরী করিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলাম। আমি নৌকা তৈরী করিতে জানি, এবং তিন সপ্তাহের ভিতর একখানি নৌকা তৈরী করিয়া দিতে পারি, বলিতেই, তিনি যেন হাতে আকাশ পাইলেন। আমার প্রস্তাবে রাজি হইয়া তিনি আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যেখানে নৌকা তৈরী হইতেছিল, উহারই নিকটে এক জায়গায় একখানি কুঁড়ে ঘর তৈরী করিয়া, উহার ভিতরে আমাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করিলাম। আমিই রাঁধিতাম। আমার তৈরী খাদ্য খাইয়া উহারা প্রশংসাই করিয়াছিল। নিজে রাঁধিয়া খাওয়ার

সুযোগটা পূর্ব্বে কখনো জুটে নাই। নানারকম অসুবিধায় পড়িয়াও চার সপ্তাহের ভিতর আমরা নৌকা তৈরী করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

পথে পথে সস্তাদরে·ভালো ভালো জিনিষ কিনিবার মতলবে নৌকায় মাল বোঝাই করিবার পর আরো জায়গা রাখা হইল। নৌকা ভাসাইয়া খানিকদূর যাইবার পরই, একটা বাঁধের উপর আটকাইয়া গিয়া উহার সামনের দিক রহিল উঁচু হইয়া, আর পেছনটা গেল জলে ডুবিয়া। নিউ সালেমের নরনারী, ছেলেবুড়া, এই ব্যাপারে নদীতীরে জড় হইয়া গেল। তাহারা নানাজনে নানা পরামর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু অফ্‌কাট মহাশয়ের বিপদের পরিমাণ যে অনেকখানি, এবং ক্ষতির পরিমাণও যে তাহার তুলনায় কম নয়, সে সম্বন্ধে তাহারা সকলেই একমত হইয়াছিল। বিপদটা সত্যসত্যই ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতেছিল। বিপদ্‌কালে জ্ঞানহারানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নৌকা যখন ডুবিতে থাকে তখন শক্ত হাতে হাল ধরিয়া, এবং মাথা ঠিক রাখিয়া নৌকা চালাইয়া যাওয়াই প্রাচীন বিধান।

দেড়দিন আমরা এইভাবে কাটাইলাম। ভাবনায় অফ্‌কাট্ মহাশয়ের চক্ষু চড়কগাছ হইয়া গেল। আমি বলিলাম, মাল নামাইতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, এই গভীর জলে?"—"না, তা নয়। একখানি নৌকা আনিয়া মালগুলি উহাতে উঠাইলেই আমি সব ঠিক করিয়া ফেলিতে

পারিব।” নৌকা আনিলে উহাতে মাল উঠানো হইল। তারপর যে দিকটা জলের উপরে ছিল তাহার নীচের দিকে একটা বড় ফুঁটা করিয়া পেছনের দিকটা টানিয়া তুলিতেই, কয়েক মিনিটের ভিতর সব জল বাহির হইয়া গেল। পারের সকলে জয়ধ্বনি দিল। অফ্‌কাট্ মহাশয়ের মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল। আমি এই কাজটা করিয়া যতটা খুসী হইয়াছিলাম, তার চেয়ে অন্ততঃ পাঁচগুণ বেশি খুসী হইয়াছিলাম অফ্‌কাট্ মহাশয়ের হাসিমুখ দেখিয়া। সত্যসত্যই, অফ্‌কাট মহাশয় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। অন্যের সঙ্গে তিনি কি রকম ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমার সঙ্গে তাহার ব্যবহার ছিল আন্তরিক। পরবর্ত্তীকালে আমি তাহার আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। হাজারে একজনও যে এ কাজ করিতে পারিত না, একথা বারবার বলিতে লাগিলেন। নিজেনিজেই “থ্রী চিয়ার্স ফর আবে লিঙ্কলন্” দিলেন। যখন তখন যেখানে সেখানে মতলব হাসিল করার মতো হীন বুদ্ধি তাহার মোটেই ছিল না।

এই ঘটনার পর হইতে পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলির উপর এই রকম বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ভাবনা আমার মগজটাকে দখল করিয়া বসিল।

আমাদের নৌকা ভাসিল। পথে এক জায়গায় অফ্‌কাট মহাশয় গোটা কয়েক শূয়র খরিদ করিলেন। শূয়রগুলির মাথা পরের কাছে বিক্রি হইয়া গেলেও, উহারা একটুও দমে নাই।

যিনি খরিদ করিলেন তিনি চাহিলেন নৌকায় তুলিতে, আর উহারা অনবরত চেষ্টা করিতেছিল, লড়াই করিয়া ছুটিয়া যাইতে। শূয়রগুলির এই সদিচ্ছার আমি প্রশংসা না করিয়া পারি নাই। কারণ, নৌকায় উঠিলে উহারা মারামারি করিয়া খোদকর্ত্তার এবং মাঝিমাল্লাদের ভয়ানক অসুবিধা ঘটাইত, সন্দেহ নাই। অগত্যা ইহারা নদীর ধার দিয়াই চলিল। অফ্‌কাট মহাশয় বিরক্ত হইয়া আমাকে একটা সহজ উপায় করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, শূয়রগুলির চোখ সেলাই করিয়া পায়ে বাঁধিয়া নৌকায় ফেলিয়া দিন, একদম সোজা হইয়া যাইবে। আবার অফ্‌কাট্ মহাশয় অজস্র প্রশংসা ছড়াইতে লাগিলেন। আমি তাহার উদারতা দেখিয়া সত্যসত্যই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

শূয়রগুলি নৌকায় তুলিয়া রওনা হইব, এমন সময়ে নজরে পড়িল, তক্তা এবং কাপড় দিয়া তৈরী করা পাল উঠাইয়া একখানা নৌকা বেশ জোরে চলিয়া যাইতেছে। একটা নূতনত্ব দেখিয়া পারের লোকদের হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিয়া যাইবার অবস্থা। লোকগুলির হাসি দেখিয়া ঐ নৌকার মাঝিকে বলিলাম, "যতক্ষণ উহার দ্বারা কাজ চালানো যায়, ততক্ষণ ঐ সকল লোককে নিঃশেষে হাসিতে দাও।" মাঝিটী ঐ পালের দ্বারাই কাজ চালাইয়া লইয়া নিজের পথে সামনে চলিতেছিল, আর ইহারা পেছনে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া শুধু হাসিয়া লইতেছিল।

নানা বন্দরে নৌকা লাগাইয়া লাগাইয়া অবশেষে আমরা নিউ অরলিন্‌সের ঘাটে আসিয়া একেবারে নৌকা বাঁধিলাম।

মালগুলি তৎক্ষণাৎ বিক্রয় হইয়া গেল। অফকাট্‌ মহাশয় বেশ দুই পয়সা লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে একদিন নৌকায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ একদল নিগ্রো ক্রীতদাসকে, তাহাদের এক শ্বেতাঙ্গ চালক তাহাদের মাথার উপর ভয়ানক জোরে চাবুক মারিতেছে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াকেও লোকে যথেষ্ট দয়া দেখাইয়া থাকে, কিন্তু এই হতভাগ্যরা মানুষ হইয়াও মানুষের কাছে তার এক কণিকা আশা করিতে পারে নাই! আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল—চীৎকার করিয়া বলিলাম, "যে জাতি এই রকম অত্যাচার প্রশ্রয় দেয়, এবং অত্যাচার করিয়া তাহা বেমালুম হজম করিতে পারে বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, সেই জাতিকে একদিন-না-একদিন এই অমানুষিক অত্যাচারের কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে।" অফ্‌কাট মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, ইহারা এই রকম অত্যাচারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। নিগ্রোদিগকে ইহারা জানোয়ারের অধিক আর কিছু মনে করে না। আমার সর্ব্ব শরীর দুঃখে ও রাগে কাঁপিতেছিল। অফ্‌কাট মহাশয়কে বলিলাম, "নিজে জানোয়ার না হইলে কেহ অপরকে জানোয়ার মনে ভাবিতে পারে না।—আমি আজ আপনার নিকট বলিয়া রাখিতেছি, যে জাতি এই রকম অত্যাচার প্রশ্রয় দেয়, সে নিশ্চয়ই নিপাত যাইবে। তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, স্বয়ং

ভগবানও না। হাতে হাতকড়ি, পায়ে শিকল পরাইয়াও ইহাদের বেদনা দেওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই!" জীবনে সেই একমাত্র দিন, যেদিন প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিয়াছিলাম। আহারে নিদ্রায়, শয়নে স্বপনে, এই রকম অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য, আমার ব্যাকুল অন্তরাত্মা অশরীরী আত্মার মতো আমার সামনে দাঁড়াইয়া, পেছনে থাকিয়া, সঙ্গে চলিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল।

ইতিপূর্ব্বে, নিগ্রোদের জন্মগত গোলামীর কথা, সুখ-দুঃখহীন জীবনের কথা, মানবজাতির এই নিতান্ত অবনত সমাজের উপর শ্বেতাঙ্গের অত্যাচারের কথা যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতেই আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। সেইদিনের এই অত্যাচার দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, নিগ্রোদাসদের মুক্তির আর বেশি দেরী নাই! ইহাদের মুক্তি-আন্দোলন যেদিন স্বুরু হইবে, জগৎ সেদিন নবযুগের এক নূতন বার্ত্তা শুনিয়া আন্দোলিত হইবে, পরাধীন গোলাম, স্বাধীন মানুষ হইবার জন্য ব্যাকুল হইবে। আমি সেদিন স্থির জানিয়াছিলাম, নিগ্রোজাতির মুক্তির জন্য, আমেরিকার কলঙ্ক-মোচনের জন্য, আমার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের এখানে সেখানে এই রকম চিন্তা খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তখন জানিতাম, অনতিদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকেই একত্র মিলিত হইয়া, এক অখণ্ড আত্মারূপে নিগ্রোজাতির মুক্তি এবং আমেরিকার প্রকৃত সম্মান আনিতে হইবে।

এত অল্প সময়ের ভিতর আমি অফ্‌কাট মহাশয়ের এতটা প্রিয়পাত্র যে হইয়া পড়িয়াছি, তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম, নিউ অর্‌লিন্‌স্‌ হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, সত্বরই তিনি নিউ সালেমে একটা দোকান খুলিবেন এবং আমাকে সেখানে থাকিতেই হইবে। আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে কথার আরম্ভ এবং শেষ করিয়া ফেলিলেন। আমাকেও একটা কিছু করিতে হইবে, কাজেই আমিও রাজি হইয়া গেলাম। দিন কতক পর যথাসময়ে সেই উদ্দেশ্যে নিউ সালেমে হাজির হইলাম। কিন্তু জিনিষপত্র তখনো সেখানে না পৌঁছায় আমি এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

নিউ সালেম একখানি ছোট শহর। মাত্র বারো-চৌদ্দ ঘর লোকের বসতি। অফ্‌কাট মহাশয়ের মালের নৌকা যেদিন রক্ষা পাইয়াছিল, সেদিন আমি ইহাদের সকলের নিকট পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাহারা সেদিনকার কথা একতিল ভুলে নাই, বরং উহাকে ফেনাইয়া বাড়াইয়া তুলিতেছিল, যখন তখন যেখানে সেখানে আমার প্রশংসা করিয়া। মনে ভাবিলাম, অপরের অপরিসীম নিন্দা করিবার শক্তি যত লোকের

আছে, প্রশংসা করিবার মতো বিরাট এবং শক্তিশালী হৃদয় সংসারে তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি। ইহারা তবু একটা কাজ করিতেছিল, আমার কিন্তু বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবং লোকের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া মোটেই ভালো লাগিতে-ছিল না।

এই সময়ে ইলেকশন চলিতেছিল। আমি সময় কাটাইবার জন্য একদিন ইলেকশন আফিসের কিছু দূরে পায়চারী করিতেছি, এমন সময়ে, অপরিচিত এক ব্যক্তি আসিয়া, আমি লিখিতে জানি কি না, প্রশ্ন করিলেন। আমি, জানি বলিতেই, আবার প্রশ্ন করিলেন, কেরানীগিরি করিতে রাজি কি না। আমার সম্মতি পাইয়া লোকটী বাধিত হইলেন, বুঝিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম, এ কাজ আমি পূর্ব্বে কখনো করি নাই, চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, তবে কাজটী নিখুঁৎ করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। দিন কতক এই কাজে কাটাইয়া দিলাম। আমার কাজকর্ম্ম নিখুৎ হইয়াছিল বলিয়াই, আমার বিদায়ের কালে কর্ত্তৃপক্ষ গন্তব্য করিয়া-ছিলেন। এই রকম এক একটা মন্তব্য আমার নিকট পরীক্ষায় প্রোমোশনের মতো মনে হইত।

ডক্‌টর নেল্‌সন সপরিবারে টেক্‌সাসে যাইবার জন্য একখানি নৌকা তৈরী করিয়াছিলেন। তখন বর্ষাকাল। সান্‌গামোন পারকূল ভাসাইয়া যেমন বড় হইয়াছিল, পাগলও হইয়াছিল তেমনি। কূল ছাপাইয়া একেবারে তিন মাইল দূরে চলিয়া

গিয়াছিল। মাঝি না-পাওয়ায় আমার ডাক পড়িল। আমি দেখিলাম, ব্যাপার মন্দ নয়! যার কোনো কাজ নাই তার অনেক কাজ। নিউ সালেমের ইলেক্‌শনে কেরানীও আমি, আবার সান্‌গামোন পাড়ি দিতে মাঝিও আমি! আমারও তখন ভবঘুরের অবস্থা, কাজেই মাঝিগিরি লইলাম। যাত্রীরা যাহার কথায় আমাকে কাজে বহাল করিয়াছিলেন, তাহারই কথায় সকল ভরসা তাহারা আমার উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন।

যাত্রার দিনে নৌকা ভাসাইলাম। সান্‌গামোনের জল কাটিয়া নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের আগেকার বাড়ীর সাম্‌নের মাঠের উপর যে তৃণগুলির কথা বলিয়াছি, সান্‌গামোনের জলের উপর দাঁড়াইয়া হাওয়ার সঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া তাহারা বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। সে দৃশ্য দেখিবার মতো চোখ এবং বুঝিবার মতো হৃদয়, ডক্‌টর নেলসনের কি তাঁহার পরিবারের কাহারো ছিল না। তাহাদের ছিল নদীর ভয় এবং পারের ভাবনা। যথাসময়ে তাঁহাদিগকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিলাম। আমার পাওনা-গণ্ডা তাঁহারা মিটাইয়া দিলেন। আমি হাঁটিয়া নিউ সালেমে পৌঁছিলাম।

আমি এ পর্য্যন্ত কাহারো নিকট আমার সেখানকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। তাহারা নানাভাবে আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখাইতেছিলেন। অফ্‌কাট মহাশয়ের মাল পৌঁছাইবার পরই তাহারা বুঝিয়াছিলেন আমি বৃথা সেখানে ঘুরিয়া বেড়াই নাই। মাল পৌঁছিবার পর, বাক্স খুলিয়া মাল

গুছাইয়া, ঠিক জায়গা মতো সেগুলিকে দোকানে সাজাইতে লাগিয়া গেলাম। মুদিখানার জিনিষ, মনোহারী জিনিষ, লোহা-পাথর এবং মাটির জিনিষ; চা-কাপ, ডিশ-প্লেট, ছুরি-কাঁটা, বুট-শু, কাফি-চা, চিনি-মাখন, গুড়-তামাক, মায় বারুদ পর্য্যন্ত আমদানী হইল। নাম করিলাম না এমন আরো অনেক জিনিষ ছিল। মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো জিনিষই বাদ পড়ে নাই। উল্লিখিত ফর্দ্দের ভিতর নাম করি নাই বলিয়া মদ বর্জ্জন করা হইয়াছিল, মনে করিবেন না। একমাত্র উহার অভাবে দোকানই চলিত না।

পরের কাজ করিয়া এমন আরাম আর কোথাও পাই নাই। এখানে আমিই ছিলাম যা কিছু সব, কখনো গোমস্তা কখনো তত্ত্বাবধায়ক, আবার কখনো বা যোগানদার। আমার সাহায্যের জন্য একজন লোক রাখা হইয়াছিল। অফ্‌কাট মহাশয়ের অন্যান্য ব্যবসাও ছিল। তিনি চারিদিকে ব্যবসার উপর ব্যবসা ফাঁদিয়া একটা প্রলয় কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাকে না পাইলে তাঁহার এই এত সাধের দোকানের কল্পনা যে তাঁহার মাথায় থাকিয়া যাইত, ইহা তিনি বহুলোকের নিকট বহুবার বলিয়াছিলেন।

আমি জানিতাম, সততার চেয়ে বড় মূলধন কোনো ব্যবসা-দারেরই নাই। পাছে খরিদ্দারেরা প্রবঞ্চিত হয়, এই ভয়ে আমি নিজের সম্বন্ধে এবং আমার সহকারীর সম্বন্ধে বেশ হুশিয়ার ছিলাম। তথাপি আমি নিজেই অনেকবার

ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। একদিন এক বৃদ্ধা জিনিষ কিনিয়া দাম দিবার সময়ে আমাকে কয়েক আনা পয়সা বেশি দিয়া গেলেন। ভুল ধরাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আমি তাহার পয়সা ফেরৎ দিয়া আসিলাম। অন্য এক রাত্রে এই রকম এক ভুল ধরাপড়ার পর এক মহিলা খরিদ্দারের বাড়ী যাইয়া আমার ভুল সংশোধন করিয়া আসি। নতুবা সেই রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতাম না। অন্ধকারের ভিতর দুই মাইল ছুটিয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু শান্তি পাইয়াছিলাম অনেকখানি। এক রাত্রিতে দোকান বন্ধ করিতেছি এমন সময়ে, এক মহিলা আসিয়া এক পোয়া চা চাহিলেন। চা ওজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন ভোরে দোকানে আসিয়াই দেখিলাম, গত রাত্রিতে চা দেওয়া হইয়াছিল এক পোয়ার স্থলে আধ পোয়া, অথচ দাম লইয়াছিলাম এক পোয়ার। আমি তৎক্ষণাৎ আর আধ পোয়া চা, দোকান বন্ধ করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম। এই রকম করার ভিতর আমার বাহাদুরীর কিছুই ছিল না। যদি তাহারা ঠিক ওজনে মাল না পাইতেন, তাহা হইলে আমার উপর তাহাদের যে একটা অটল বিশ্বাস ছিল তাহা ভাঙিয়া পড়িতে খুব বেশি দিন লাগিত না। দোকানের মালিক যে একটা জোচ্চুরির আড্ডা ফাঁদিয়াছেন, এরূপ কথাও খরিদ্দারেরা সাম্‌না সাম্‌নি বলিতে ছাড়িত না। আমি দুর্নাম এবং দুর্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সদ্ভাব এবং সুনামের পক্ষপাতী। আমি নিজের স্বার্থের জন্যই লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া আমার ভুল

শোধ্‌রাইয়া আসিয়াছিলাম। যদি কেহ কখনো আমার অবস্থায় পড়েন, তাহা হইলে সর্ব্বদা সৎপথে সদ্ভাবে চলিতে যেন চেষ্টা করেন। চালাকি করিয়া দুই চারি দিন বেশ ভালোভাবে চালানো যায় বটে, কিন্তু চিরদিনের জন্য লোকের সহানুভূতি পাইতে বঞ্চিত হইতে হয়। দেউলিয়া হইয়া কি ভাব জগতে কি বস্তুজগতে কোথাও চলা যায় না।

দোকানদারীর আমলে আমাকে নানা বয়সের নানা রকমের লোকের সঙ্গে চলিতে হইত। এক রকম লোকের নিকট ওয়াশিংটন, ফ্রাঙ্কলিন এবং দাসত্বের বিরোধী হেন্‌রী ক্লে-র জীবনী বর্ণন করিতাম। আবার আর এক দলের নিকট তাহার খানিক পরেই হয়ত হাসি-ঠাট্টা চালাইতাম। কি রাজনীতি, কি মদ্যপান, কি ঘরকন্না, কি ধর্ম্মতত্ত্ব—সকল বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতাম। ছেলেদের নিকট, মিসিসিপির চেহারা, ভাব-ভঙ্গী এবং মিসিসিপি-যাত্রায় যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সব জাঁকালো করিয়া ধরিয়া দিতাম। নিগ্রোদের দুঃখের কাহিনী, শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার, এ সবও আমি তাহাদিগকে বহুবার শুনাইয়াছি। এইভাবে আমি সকলকে এক জায়গায় আটক করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহাদিগকে মানুষ করিবার মতলবেই আমি হাতে রাখিবার চেষ্টা করিতাম। আমি বিনা পয়সায় ইহাদিগকে মনের খোরাক যোগাইয়া, ইয়াঙ্কি-সমাজের ভিতর দিকটা নূতন করিয়া গড়িতেছিলাম, আর ইহারা নগদ দামে দেহের খোরাক কিনিয়া অফ্‌কাট মহাশয়ের লাভের

অঙ্কটা বাড়াইয়া দিতেছিল। কিন্তু মোটের উপর ক্ষতিগ্রস্ত আমরা কেহই হই নাই।

ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামের জন্য পরিপূর্ণভাবে তৈরী হইবার উদ্দেশ্যে, এই সময়ে আমি ইংরেজী ব্যাকরণ পড়িতে সুরু করি। দোকানের কাজ, তারপর, অফ্‌কাট মহাশয়ের মিলের তত্ত্বাবধান —এ সবের পর দিনের বেলায় পড়ার মোটেই সময় পাইতাম না। কাজেই, গভীর রাত্রিতেই পড়ার সময় ঠিক করিলাম। একজনের নিকট একখানা বইয়ের সন্ধান পাইয়া তাহা আনিতে গেলাম এবং তাহার সাহায্য চাহিলাম। এত বেশি খাটুনি আমার সহ্য হইবে না, বলিয়া, তিনি আমাকে অনেক হিতকর উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, “দেখুন, ধনী যে সময়ে আরামে নিদ্রা যায়, সারাদিনের খাটুনির পর দরিদ্রের চক্ষে তখনো নিদ্রা আসে না। পরদিনের পেটের ভাবনা, প্রভাত হইতেই জীবন-সংগ্রামের জন্য আবার হাতিয়ার শানানোর চিন্তা, পরদিনের লড়াইয়ের জন্য নূতন নূতন কৌশল বাহির করিবার চেষ্টা, তাহাকে পাগল করিয়া তুলে। মহাশয়, দরিদ্র উঠিতে চায়, সেও দাঁড়াইতে চায়। কিন্তু চারিদিককার অভাবের ভিতর সকলেই পারে না। যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার মতো শক্তি ও ধৈর্য্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। চরিত্র-বলে সে একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই জয়ের চেয়ে আজ পরাজয়েই তার বিশ্বাস বেশি। তাহার এই মিথ্যা ধারণা ও ভুল বিশ্বাসকে দূর করিয়া দিয়া, তাহার জীবন-সংগ্রামকে

সার্থক করিবার জন্য; তাহার জীবনে সুদূরপরাহত জয়ের আশাকে মনের একেবারে সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া, একেবারে পরশের এলাকায় টানিয়া আনিয়া, তাহার নিরাশ জীবনে আশার জয়পতাকা উড়াইবার নিমিত্তই, আমার কঠোর পরিশ্রম করা নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে! আপনি এজন্য আমাকে সাহায্য করিলে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব।"

ইংরেজী ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলাম। রাত্রির ঘুম যতটা সম্ভব কমাইয়া দিলাম। দোকানে যখন লোক থাকিত না সেই সময় ব্যাকরণখানা পড়িতাম। এইভাবে প্রাণপাত খাটুনির পর একদিন আমার সাহায্যকারী বন্ধুটীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, ব্যাকরণে আমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি।

নিউ সালেমে কতকগুলি যুবক মিলিয়া একটা দল গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহারা ছিল জনসাধারণের নিকট একটা ভয়ের বস্তু। পশ্চিমাঞ্চলের সকল স্থানেই তখন এই রকমের ছোট-বড়-মাঝারি অসংখ্য দল ছিল। অজ্ঞতা, বর্ব্বরতা এবং পাশবিকতা, এই তিনের মিলন ঘটিয়াছিল এই দলের সভ্যদের ভিতর। ইহারা প্রত্যেকেই ছিল এক একটী পয়লা নম্বরের গুণ্ডা। কোনো নূতন লোককে দলে লইবার সময় ইহারা খুব জোরে তাহার পেছনে এক ঘা বেত কষিত। ইহাই ছিল নূতন সভ্যকে দীক্ষাদানের রীতি।

নিজ চোখে কিছু দেখিয়াই হোক, অথবা অফ্‌কাট মহাশয়ের অতিরিক্ত বর্ণনা শুনিয়াই হোক, ইহারা আমাকে

দীক্ষা না দিয়াই দলে টানিয়া লইয়াছিল। আমি দলের সভ্য ছিলাম এই পর্য্যন্ত, এ ছাড়া ইহাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক আমার ছিল না। এই দলের সর্দ্দার ছিল জ্যাক্‌। একদিন কথায় কথায় এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, অতঃপর জ্যাকের সহিত একটা মল্লযুদ্ধ না করিয়া আমার আর উপায় ছিল না। কুস্তীতে জ্যাক্‌ হারিয়া গেল। আমি তাহার দুই পায়ে ধরিয়া মাথার উপর দিয়া এমনভাবে ঘুরাইলাম যে, তাহাতেই জ্যাক্‌ তাহার ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিল। জ্যাকের শিষ্যবর্গ এমন অবস্থায়ও গুরুকে উৎসাহ দিতে ছাড়ে নাই। কারণ জ্যাকের ডঙ্কাটা তাহারাই বাজাইয়া ছিল বলিয়া, অপমানের ভাবনাটা ছিল তাহাদেরই বেশি। দলের যে কর্ত্তা হয়, অন্য সকলের অজ্ঞাতে নিজের মধ্যে সে এমন একটা গুণ লুকাইয়া রাখে যার দাম অনেক বেশি এবং সেটা শুধু কার্য্যকালেই প্রকাশ পায়। জ্যাক্‌ কুস্তীর শেষে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বন্ধুত্ব করিল। এই বন্ধুত্ব আমাদের এখনো অটুট রহিয়াছে।

সর্দ্দারের পরাজয়ের কথাটা শুনিয়া অফ্‌কাট মহাশয় বলিলেন, "আমি তো তোদের আগেই বলেছিলাম বাপু! দুনিয়াটার অনেক কিছুই দেখেছি, তোদের চেয়ে জানিও ঢের বেশি ; এমন কি, তোদের কার কিস্মৎ কতটুকু তাও আমার জান্‌তে বাকি নেই!" অফ্‌কাট মহাশয়ের সহৃদয়তাকে আমি এখনো শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার বহুদর্শিতার বক্তৃতা শুনিয়া হাসি চাপিয়া রাখা কষ্ট হইত। বস্তুতঃ তিনি আমাকে নিঃস্বার্থ-

ভাবে খুবই ভালোবাসিতেন, এবং ভালোবাসিতেন বলিয়াই হয়ত অনেক বেশি বেশি বলিতেন। অতঃপর অফ্‌কাট মহাশয় একজন বহুদর্শী লোক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এবং এই স্বীকৃতিটা পাকাপাকি ভাবে সকলে গ্রহণ করিয়াছিল, আমার আজিকার অবস্থা লাভ করার পর। যাহা হোক, ধীরে ধীরে গুণ্ডার দলটী ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অতঃপর সভ্য-নাগরিকের জীবন যাপন করিতে চাহিল।

ব্যাকরণ পড়ায় কতকটা অগ্রসর হইবার পর, রাত্রিতে দোকানের কাজ শেষ করিয়া আলোচনা সভায় যোগ দিতাম। এজন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান আমার ছিল না। কোনো কোনো-দিন রাত্রিতে ছয় সাত মাইল দূরে যাইয়াও আলোচনা সভায় যোগ দিতাম। এই সকল সভার সভ্যরা লেখা-পড়ার ধার ধারিত না। ইহারা সকলেই না-পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিল, লেখাপড়াটা ইহাদের ধাতে সহিত না। একমাত্র খাওয়া-পরার বুদ্ধি ছাড়া, আর কোনো চিন্তাই ইহাদের মাথায় আসিত না। অথচ স্থানে স্থানে আলোচনা-সভার সৃষ্টি করিতেও ইহারা ছাড়ে নাই। ইহাদের কোনো কোনোদিনের তর্কের কথা মনে করিয়া প্রায়ই হাসিতাম। তথাপি আমরা কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই। আমাকে ইহাদের সঙ্গে পাইয়া ইহারা যেমন খুসী হইত, ইহাদের প্রবল আগ্রহ দেখিয়া আমিও তেমনি যথেষ্ট ভরসা পাইতাম। বাজে আলাপ, বাজে চিন্তার চেয়ে এই রকম সভার দাম অনেক বেশি।

যেদিন তর্ক-সভায় যাওয়ার সুযোগ হইত না, সেদিন বাসায় ফিরিয়া সাপ্তাহিক অথবা মাসিক কাগজ পড়িতাম। লুইস্‌ভিলার-জার্ণালখানিই ছিল আমার বেশি প্রিয়। কাগজখানির রাজনীতি সম্বন্ধীয় লেখাগুলি অন্য সকল কাগজের লেখার চেয়ে আমার বেশি ভালো লাগিত। ইহার রঙ্গরসগুলিও বেশ প্রাণবন্ত ছিল।

এমন দিন গিয়াছে, যেদিন পয়সার অভাবে পোষাক তৈরী করিতে পারি নাই, কিন্তু এই জার্ণালের টাকা বৎসরের পর বৎসর ঠিক ভাবে পাঠাইয়া দিয়াছি। নেশাখোরের নেশা সাময়িক, কিন্তু পাঠকের নেশা চিরস্থায়ী। মাদকদ্রব্য মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনাশ করিয়া, মৃত্যুর দুয়ার দেখাইয়া দিয়া তবে ছাড়ে, কিন্তু জ্ঞানের নেশা সুধার তুল্য—মানুষকে অমর করিয়া দেয়। জ্ঞান,স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-বল-বুদ্ধি-চরিত্র আনিয়া দেয়। আমি চিরদিন কামনা করিয়া আসিতেছি, "মানুষ জ্ঞান লাভ করুক, বিত্তসম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজেরা এক একটী জ্ঞান-মন্দির হইয়া গড়িয়া উঠুক ; পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে, জ্ঞানীর জ্ঞান প্রচারিত হউক ; জ্ঞান রাজা হউক, জ্ঞান গুরু হউক, দাসত্ব লুপ্ত হউক, মানুষ মানুষ হউক !"

আমার সময় এবং সুযোগের অভাব যে অনেকখানিই ছিল তাহা আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কোনো সময়ে দোকানে খরিদ্দার না-থাকিলে হয়ত বই লইয়া পড়িতে বসিতাম। সেই সময়ে মনিবের শিশু-সন্তানটী কাঁদিতে থাকিলে তাহাকেও সান্ত্বনা দিতাম। এইভাবে আমাকে দীর্ঘকাল কাটাইতে হইয়াছে।

নিজের মানুষ হওয়ার ভাবনা অষ্টপ্রহর তো ছিলই, তা ছাড়া একই সময়ে, মনিবের দোকানে এবং ঘরে দুইদিকেই যখন তাল সামলাইতেছিলাম, সেই সময়ে সান্‌গামোনের বিপন্ন-তরণীগুলির রক্ষার চিন্তাও আমার মাথার ভিতর ছুটাছুটি করিতেছিল। কিন্তু একাগ্রভাবে আমি সে সাধনায় মন দিতে পারি নাই। নিজের এলাকায় থাকিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া সাধনা করা চলে, কিন্তু পরের দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া তাহা সম্ভব হয় না। আমার মতো কোটী কোটী দরিদ্রের পক্ষে উদরের চিন্তা ভুলিয়া থাকা যেমন অসম্ভব, আমাদের জ্ঞানের সাধনাও সচ্ছল অনেকের নিকট তেমনি হয়ত বাবুয়ানা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ যে সহজাত সাধনা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলাও অসম্ভব। সে চেষ্টা করিলে, বরং সে আরো বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" হঠাৎ একদিন 'টেলিসম্যান'-জাহাজ সান্‌গামোনের উপর দিয়া, আমারই উদ্দেশ্যে আসিয়া, নিউ সালেমের ঘাটে নোঙ্গর করিল। সান্‌গা-মোনের বিপন্ন-তরণীগুলির রক্ষার জন্য যে চিন্তা আমি এতদিন করিতেছিলাম, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য ইলিনয়রাষ্ট্র খরচা সমেত এই জাহাজখানি পাঠাইয়াছিলেন। আমি উপায় বাহির করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াছিলাম।

অফ্‌কাট মহাশয়ের ব্যবসা-বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবসায়ের বাতিকটাও ছিল যথেষ্ট প্রবল। এমন কতকগুলি ব্যবসা

তিনি ফাঁদিয়াছিলেন, যার দ্বারা লাভ করাতো দূরের কথা, লোকসান দিয়াও তিনি রেহাই পান নাই। দিনের পর দিন অবনতি যেন তাঁহাকে ধাপে ধাপে টানিয়া নামাইতেছিল। দোকান বন্ধ হইল, মিল অচল হইল, সমস্ত আশা-ভরসা দূরে গেল। অফ্‌কাট মহাশয়ের সম্মুখে-পশ্চাতে, ডাইনে-বায়ে গাঢ় অন্ধকার ঢালিয়া দিয়া চিরদিনের মতো তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। আমি সেদিন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারি নাই। মানবজীবন কি রহস্যময়!

৮

হাওয়ার আগে প্রচারিত হইয়া পড়িল, ইলিনয়ের গবরনর চার রেজিমেণ্ট সৈন্যদল গড়িবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক চাহিয়াছেন। হঠাৎ এরূপ আদেশের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই চলিতেছে। সেইজন্যই ইলিনয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি ভয়ানকরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

আমার হাতে তখন কোনো কাজ ছিল না। বসিয়া থাকা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। কাজ যাহা সামনে পড়িয়াছে তাহা উপেক্ষা করিয়া, অনাগতের জন্য অপেক্ষা করা আমার ভালো লাগে না। অনেকদিন হইতেই আমার এই রকম একটা ইচ্ছা ছিল, কাজেই, এখন এই সুযোগটা হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিলাম না। সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়াই স্থির করিলাম। আমার এই ইচ্ছা জানিয়া নিউ সালেমের বন্ধুরাও সৈন্য হইতে রাজি হইল। আমার বন্ধুদের, স্বত্ব-বজায় রাখার চেষ্টার চেয়ে, রেড্ ইণ্ডিয়ান্-বিদ্বেষটাই ছিল অত্যন্ত প্রবল।

নিউ সালেমের গুণ্ডার দল এখন আর নাই। তাহারা ধীরে ধীরে সভ্যতার স্তরে উঠিতেছিল। আমার সঙ্গে

তাহারাও বিনা বিচারে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া গেল। এই যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য নিউ সালেমের বৃদ্ধরাও তৈরী হইলেন। লোকজন যাহা জুটিল, সংখ্যায় তাহা নিতান্ত কম ছিল না। আমি দেখিলাম, তাহাতে এক কোম্পানী সৈন্যদল গড়িয়া ফেলা যায়। শেষ পর্য্যন্ত হইল তাহাই। কিন্তু দল তখনো নেতৃহীন। নিউ সালেমের বেশির ভাগ লোক চাহিল আমাকে ক্যাপ্টেন করিতে, আর জনকতক লোক চাহিল অপর আর একজনকে। লোকদের ভালোবাসার ফলে, বারো আনা ভোটে আমি কাপ্টেন নির্ব্বাচিত হইলাম।

ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইহারা যেরকম জোরে চীৎকার স্থরু করিয়া দিয়াছিল, সে ধ্বনির এলাকার ভিতর থাকিয়া থাকিলে রেড্ ইণ্ডিয়ানরা নিশ্চয়ই ভয় পাইয়াছিল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর এক ব্যক্তি চীৎকার থামাইয়া বলিলেন, নূতন ক্যাপ্টেনের নিকট সকলেই কিছু শুনিতে চায়। তাহাদের বন্ধু হইলেও আমি তখন ক্যাপ্টেন। তাহারাও বন্ধুত্ব ভুলিয়া তখন আমার এই যোগ্যতাটা যাচাই করিতে চাহিল। আমিও গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ। অন্য কাহারো উপর এই কাজের ভার না দিয়া আমার উপর কেন দিয়াছেন, তাহা আপনারাই জানেন। তবে আপনারা আমার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাহা চিরদিন অচল অটল থাকিবে,আমার নিজের দিক দিয়া জোর করিয়া এইটুকু আপনা-

দিগকে বলিতে পারি।” অতঃপর দুই একজন বন্ধু যাহারা এই ভোটযুদ্ধে সেনাপতির কাজ করিয়াছিলেন, আমার যাহারা সত্য সত্যই হিতৈষী, তাহারা আসিয়া টুপী নামাইয়া ‘ক্যাপ্টেন লিঙ্কল্‌ন্’ বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন, আমিও তাহার যথোচিত জবাব দিলাম। সেই দিন আর এই দিন! আজ সে সব কথা মনে করিতেও আনন্দ বোধ হয়।

নিউ সালেমের নবগঠিত কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া ছাউনি করিল। ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতে এক মাসের ভিতর যখন যুদ্ধের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না, তখন তাহারা বাড়ী ফিরিয়া গেল। কিছুদিন পর আবার এক সৈন্যদল গড়িবার জন্য আদেশ পৌঁছিতেই আমি আবার নূতন ভাবে উহাতে ভর্ত্তি হইলাম। পুনরায় ত্রিশদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। তৃতীয়বারে যখন সৈন্যদল গঠিত হয়, তখনো আমিই সকলের আগে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। তৃতীয়বারের সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়।

আমি তখন বাড়ী ফিরিলাম। পথে আমার ঘোড়াটী মারা গেল। ডোঙ্গায় চড়িয়া নদী পার হইয়া হাঁটিতে সুরু করিলাম। এইভাবে ৪০ মাইল পথ কতক নৌকায় চড়িয়া কতক পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী পেঁ ৗছিলাম।

শ্বেতাঙ্গদের রেড্ ইণ্ডিয়ান্-বিদ্বেষটা কত প্রবল ছিল, আমার প্রথম সৈনিক জীবনের একটা ঘটনা হইতেই বুঝিতে

পারিবেন। আমি আমার স্বদেশী স্বজাতি খৃষ্টানদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতেছিলাম। কবে ইহারা মানুষ হইবে আমি কেবল সেই চিন্তাই করিতাম! ইহারা না-পারিয়াছিল কেনা-গোলাম নিগ্রোদিগকে ভালোবাসিতে, না-পারিয়াছিল রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌দিগকে আপনার করিয়া লইতে। প্রেমিক পুরুষ খৃষ্টের ভক্ত হইয়াও ইহারা কোনো দিন সে বস্তুটীর সন্ধান লওয়ার দরকার মনে করে নাই। দুনিয়ায় আর কোনো জাতি থাকিবে না, আর কোনো মানুষ থাকিবে না, খৃষ্টধর্ম্মের গীতা পড়িয়া ইহারা যেন এই শিক্ষাই পাইয়াছিল। যে নিগ্রো ইহাদের সভ্যতার মাপকাঠিতে অনেক ছোট বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল,আমার বিচারে তাহারা এই সব ধনী এবং দরিদ্র খৃষ্টানদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। ভবিষ্যতে এই আমেরিকান্ জাতি হয়ত জগতের পক্ষে সকল দিক দিয়াই গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহার আজিকার ব্যবহার, মানব-সভ্যতা-ইতিহাসের এক শোচনীয় অধ্যায়ের উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়।

একদিন আমার শিবিরের পথে এক ইণ্ডিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে অতি বিনীত এবং ভদ্র-ভাবে বলিল, "আমি শ্বেতাঙ্গজাতির বন্ধু, এবং আপনার সৈন্যদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।" আমাদের দলের এক ছোক্‌রা সৈনিক অমনি গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমরা উহাদের ধ্বংসের জন্যই আসিয়াছি। উহাকে দয়ার পরিবর্ত্তে শেষ করিয়া দিলেই ঠিক কাজ করা

হইবে।” সঙ্গে সঙ্গে আবার এক চীৎকার উঠিল, “গুলী কর, গুলী কর”। আবার এক রব উঠিল “ওটা গোয়েন্দা, ওটা গোয়েন্দা!”

ব্যাপার দেখিয়া লোকটা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং জামার পকেট হইতে ধীরে ধীরে একখানা ভাঁজকরা কাগজ বাহির করিয়া আমাকে পড়িতে দিল। মাত্র দুই লাইন উহাতে লেখা। ঐ দুই লাইনে যাহা ছিল অনেকের সারা জীবনেও তাহা লাভ হয় কিনা সন্দেহ। ইণ্ডিয়ানটির নিকট নানাভাবে উপকৃত হইয়া এবং পরখ করিয়া দেখিয়া, সেনাপতি কাস্ তাহার সচ্চরিত্রতার এবং সদ্ব্যবহারের জন্য এই প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। সেনাপতির নামসহি উহাতে ছিল। মানুষের পক্ষে যতগুলি সদ্‌গুণ থাকা দরকার তাহার কোনোটি হইতেই সে বঞ্চিত নহে দেখিলাম। কাগজখানা পড়ার পর আবার আমার সৈন্যদলে এক রব উঠিল, “লোকটা ভয়ানক জুয়াচ্চোর, এখানা জাল সার্টিফিকেট। ওকে বিশ্বাস করা, আর খাল কাটিয়া উঠানে কুমীর আনা একই কথা।” এই রকম অনেক হুশিয়ারী কথা শুনিলাম। এই একটি মাত্র লোকের ভয়েই আমার সৈন্যদল চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমার হুকুমের অপেক্ষা না-করিয়াই উহারা লোকটিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তৈরী হইল। আমি এমন তাণ্ডব নৃত্য জীবনে কোনো বড় যুদ্ধেও দেখি নাই। পরম শত্রুর প্রতি অভদ্রতার যে চরম দৃষ্টান্ত ইহারা আঁকিয়া রাখিতে চাহিল, তাহাতে ঘৃণায় ও লজ্জায় সেদিন

আমার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। একটু অপেক্ষা করিবার ফুসরৎও ইহাদের ছিল না। সত্য সত্যই, যখন ইহারা হত্যা ব্যাপার ঘটাইবার জন্য তৈরী হইল, তখন আমি উভয় পক্ষের ভিতর লাফাইয়া পড়িয়া বলিলাম, "আমি ইহাকে মারিতে দিব না। জেনারেল কাসের হুকুম মানিতেই হইবে।" উহারা গর্জ্জন করিয়া জবাব দিল, "আমরা উহাকে গুলী করিবই"। আমার আর সহ্য হইল না। পুরাপুরি সোজা দাঁড়াইয়া বলিলাম, "আমাকে গুলী না-করা পর্য্যন্ত, তা হবে না। তোমরা ভোটের জোরে আমাকে তোমাদের ক্যাপ্টেন করিয়া যে পোষাক পরাইয়া দিয়াছ, তার ভিতরের লিঙ্কল্‌ন্‌ আর সেই ছেঁড়া পোষাকের ভিতরকার লিঙ্কল্‌ন্‌, একভাবেই আছে এবং চিরদিন একভাবেই থাকিবে জানিও। তোমরা নিজেরা চরিত্রহীন তাই অপরের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে জানো না। তোমরা "জাল-জুয়াচ্চোর" ইত্যাদি হীন শব্দ ব্যবহার করিয়া নিজেদের ইতরামির পরিচয়ই দিয়াছ। সে এত বড় চরিত্রবান যে, তোমাদের একটা সৈন্যদল তাহার ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বন্দুক হাতে লইলেই লোক সাহসী হয় না, সে হয় তখন ঘোর অত্যাচারী। সাহসী বন্দুকের অপেক্ষা রাখে না। মনে রাখিও, আমি তোমাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছি বলিয়া, আমার মাথা বিক্রি করি নাই, এবং সেইজন্যই তোমাদের প্রত্যেকের হুকুম তামিল করিতে পারিলাম না। সৈন্যদলের পক্ষে যে সকল গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং যে সকল দোষ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দরকার

তাহা তোমরা শিক্ষা কর নাই। এই রকম দুর্বিনীত দুশ্চরিত্র লোক যে কোনো দেশের যে কোনো জাতির কলঙ্ক—এই রকম সৈন্যদল ততোধিক ঘৃণার পাত্র।”

আমার এই কথার পর উহারা দমিয়া গেল। যাহারা এতক্ষণ লাফালাফি করিতেছিল তাহারা এইবারে পেছন ফিরিল। কিন্তু মূর্খের অশেষ দোষ। ভিতরে ভিতরে রাগে উহারা জ্বলিতেছিল। একটী লোক আর সহ্য করিতে না পারিয়া, আমার এই ব্যবহারটা আমার কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নয়, একেবারে সোজা বলিয়া ফেলিল। আমি এই শেষবার আক্রমণ করিবার জন্য তৈরী হইলাম। আমার কাপুরুষতা উহাদিগকে যাচাই করিয়া দেখিতে বলিলাম। অতঃপর তাহারা আর কখনো আমাকে কাপুরুষ বলিতে সাহস করে নাই। এই ঘটনার পর হইতে আমার জীবন বিপন্ন বোধ করিতেছিলাম। ইহারা একে আকাট মূর্খতো ছিলই, তার উপর, মদ্যপান, কথায় কথায় শপথ এবং কুৎসিত আলোচনা ও গান, দুর্নীতির এই তিন খণ্ড আত্মা একত্র মিলিয়া ইহাদের মূর্খতাটাকে আরো বড় এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। নরক এবং নরকের জীব ইহার চেয়ে আর কি ভীষণ হইতে পারে তাহা আমার ধারণায় আসে না! ইহারা করিতে পারিত না এমন কুকর্ম্ম কিছু ছিলনা বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সমুদয় ইয়াঙ্কি-সমাজ তখন সভ্যতার একেবারে নিম্নস্তরে ছিল বলিতে পারি।

যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলে নিউ সালেমের লোকেরা আবার

আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিল। এবারে যে বন্ধুটির বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম তাহার নাম জে আর হ্যারগুন্‌। বন্ধুটির একটী পুত্র আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী ছিল। আমি যখন প্রতিবেশী অনাথা বিধবাদের এবং অনাথ সন্তানদের জন্য কাঠ কাটিতে যাইতাম সে-ও তখন আমার সঙ্গে থাকিত। কুড়ুল তুলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না বটে, কিন্তু আমার কর্ম্মের প্রভাব তাহার শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। আমি যখন বিশ্রাম করিতাম সে তখন কুড়ুলের বাট ধরিয়া টানাটানি করিত। এইরূপেই মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বাধ্য হইয়া প্রভাবিত হইয়া থাকে। বড় হইয়া সে-ও এই রকম অনেক কাজ করিয়াছে।

যদিও তাহারা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন, তথাপি বন্ধুর পরিবারে আর থাকা ঠিক মনে করিলাম না। আমি জীবিকার জন্য কামারশাল খুলিব স্থির করিলাম। আমার বন্ধু উইলিয়াম গ্রীন্‌ আমার এই প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। এ্যাঃ, কামার! মন্দ নয়, ক্যাপ্টেন লিঙ্কল্‌ন্‌ হইতে একেবারে কামার লিঙ্কল্‌ন্‌, বেশ মানাবে বটে! এই রকম একটা প্রস্তাব যে আমি কখনো করিতে পারি, এটা সে ধারণাই করিতে পারে নাই। আমি বলিলাম, গ্রীন্‌ আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি ক্যাপ্টেনের জন্য মানব-সমাজের কাজ আটকায় না। কিন্তু কামারের জন্য তাহাকে অনেক-খানিই অপেক্ষা করিতে হয়। তোমরা পদগৌরবের মোহে

আচ্ছন্ন হইয়া থাক তাই, ক্যাপ্টেন-কামার, ইতর-ভদ্র ইত্যাদি ভাব মনের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেন-পদের গৌরব তো অতি ছোট, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পদকে আমি কর্ম্মের দ্বারা বড় করিয়া না তুলিলে উহার সাধ্য কি যে, আমাকে বড় করিয়া তোলে। বৃথা পদের মোহই মানুষকে পদে পদে খোঁড়া করিয়া দেয়। মানুষ যদি মানুষ না হয়, তবে পদ-গৌরব কি তাহাকে মানুষ করিতে পারে!

কথায় কথায় জানিলাম নিউ সালেমের লোকেরা ব্যবস্থাপক সভার জন্য আমাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে চাহে। আমি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ বিশ্বাস করিবার কোনো হেতু সাম্‌নে খুঁজিয়া পাইলাম না। উইলিয়ামের কথায় বুঝিলাম, নিউ সালেমের উদারমতাবলম্বীরাই ইহার উদ্যোক্তা। এই আলাপের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত আমি জন কতক ডেমোক্রাট্ নেতার নামই শুনিয়াছিলাম। এই এক রাত্রের ভিতর তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, আর অজ্ঞাতকুলশীল আমার কথাটাই সকলের সাম্‌নে এত বড় হইয়া দেখা দিল, ইহা বিশ্বাস করিতেই পারিলাম না। শেষে দেখিলাম, সকল দিক দিয়া তাহার কথাই সত্য। হঠাৎ এক 'আল্‌টিমেটাম' আসিয়া হাজির হইল—চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর নিউ সালেমের প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা এ সম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিলেন। আমি এ ব্যাপারে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলাম। শেষ পর্য্যন্ত ইহা একটা হাস্যকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, ইহাই আমার

বড় ভয়। এত অসম্ভব কখনো সম্ভব হয় না, অনেক ওজর-আপত্তি, আমার ক্ষতি তাঁহাদের ক্ষতি, একে একে সবই তাঁহাদিগকে খুলিয়া বলিলাম। কিন্তু কিছুই টিকিল না। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাদের সম্মান রাখিবার জন্যই দাঁড়াইতে রাজি হইলাম। নির্ব্বাচনের দিনে আশার চেয়ে নিরাশার দিকেই আমার মন তাকাইয়া রহিয়াছিল বেশি সময়। ফল বাহির হইলে দেখা গেল, এক নিউ সালেম হইতেই আমি ২৮৪ ভোটের ভিতর ২৭৭ ভোট পাইয়া প্রথম হইয়াছি। আমি এত বড় অসম্ভব ব্যাপারটাকে নিজের চোখে সম্ভব হইতে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না।

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার এক জায়গার জনসাধারণ আমার মতামত জানিতে চাহিলেন। বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলিলাম, "সমাগত ভদ্রমহোদয় এবং নাগরিকগণ, আশা করি আপনারা আমাকে জানেন। আমি দীন দরিদ্র এবং নগণ্য লিঙ্কল্‌ন্‌। আমার বন্ধুগণের অনুরোধেই আমি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ-প্রার্থী হইয়াছি। আমার রাজনীতি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সংক্ষিপ্ত বলিয়াই মনোরম। আমি কোনো জাতীয় ব্যাঙ্কের হিতকামী। দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি এবং শিল্প-সংরক্ষণের দিকেও আমার যথেষ্ট লক্ষ্য রহিয়াছে। ইহাই আমার অন্তরের কথা এবং আমার রাজনীতির গোড়ার কথা। যদি নির্ব্বাচিত হই, অনুগৃহীত হইব, যদি না হই, তাহা হইলেও আমার কোনো দুঃখ থাকিবে না।"

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য যাহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারা নাকি এই ব্যাপারটাকে একেবারে বিরোধিতার সীমানায় আনিয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। আমি যে নিতান্ত দরিদ্র এবং পাড়াগেঁয়ে, সেটা তখন এবং এখন, সকল সময়েই আমার জানা আছে। আমার তাহাতে রাগ বা দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আমার দৈন্যটা যদি আমারই মনের চোখে না-ঠেকে, তাহা হইলে আর এই বৃথা প্রচারের কি প্রয়োজন। এতদিন পরে এই কথা শুধু এই কারণেই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাহারা লোকের নিকট নিজেদের চিত্তদৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া শুধু ইয়াঙ্কি-সমাজকে নয়, সমুদয় মানব-সমাজকেই ছোট করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মপ্রসারতা। ভাবের ঘরে কেহ চুরি না করে, ভাষার ভিতর কোনো চাতুরী না থাকে, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভোটের জোরে সদস্য হওয়াটাই আমাদের পক্ষে বড় কথা নয়, সদস্য হইয়া আমেরিকার সেবায় আত্মনিয়োগটাই বড় কথা। যদি জন্মভূমির সেবাটাই আমাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে কোনো রকমেই সেখানে বিরোধ আসিতে পারে না। সেখানে আসিবে, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ এবং নাম-যশের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে, প্রীতি এবং ভালোবাসা; নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশবাসীর মান-প্রাণরক্ষার প্রবল আগ্রহ।

নির্ব্বাচনের হাঙ্গামা কাটিয়া গেলে আবার জীবিকার চেষ্টা

করিতে লাগিলাম। কিন্তু উইলিয়াম ওসব বাজে চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া আমাকে আইন পড়িবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমার মস্তিষ্ক সে কাজের উপযুক্ত নয় বলিলাম। কিন্তু সে কি ছাড়ে! আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানিতাম বোধ হয় সে তাহার বেশি জানিত। ইতিপূর্ব্বেও অনেকে আমাকে আইন পড়িবার জন্য বলিয়াছে, অথচ আমি নিজে তাহাতে কেন ভরসা পাই নাই, তাহা বুঝিতাম না। কামারশালের কথা পাড়িতেই উইলিয়াম চটিয়া লাল হইল। অপর লোককে বুঝানো যায়, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের চিন্তার উপর উঠে কার সাধ্য! এ ব্যবসার দিকে আমার পিতার যে যথেষ্ট ঝোঁক ছিল, তাহাও বলিলাম, কিন্তু সে একেবারে নির্ব্বাক, গম্ভীর। আমিও ফিকিরে রহিলাম।

আমাকে আর কামার হইতে হইল না। বন্ধু হ্যারগুন্‌ তাহার মুদিখানার অংশ আমার নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিলেন। উইলিয়াম দোকানের জন্য প্রায় পাঁচশত টাকার জিনিষপত্র কিনিয়া দিল। হ্যারগুনের অংশীদারের নাম ছিল বেরী। অংশ কিনিবার পর মুদিখানার নাম হইয়াছিল, 'লিঙ্কল্‌ন্‌ এণ্ড বেরী'। কামারশালের পরিবর্ত্তে মুদিখানা গ্রীনের এত প্রিয় হইল কেন, বুঝিলাম না। কামার তবু কিছু ভাঙ্গে-গড়ে, তার জীবনে নূতনত্ব বৈচিত্র্য অনেকখানিই আছে, কিন্তু মুদির তো সে সবের কোনোটাই নাই! দোকান চলিতেছিল ভালোই, কিন্তু বেরী নানাভাবে চরিত্রকে অধঃপাতে দিয়া দোকান-

খানার সর্ব্বনাশ করিল। যখন খাতা খুলিয়া হিসাব করিলাম তখন দেখা গেল, বেরী আমার মাথায় চিন্তার এক বিরাট বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে—মূলধন শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, দোকান দেনায় তল। গ্রীন্‌কে দেওয়ার জন্য একটা কানাকড়িও তহবিলে নাই। আমার অবস্থা দেখিয়া গ্রীন্ নিজে হইতেই বলিল, তাহার টাকার জন্য আমাকে ভাবিতে হইবে না। সুবিধা মতো দিলেই চলিবে। যদি টাকা না দিই তাতেও তার কোনো ক্ষতি নেই। পয়সা-কড়ি দিয়াই বন্ধুত্বের যাচাইটা করা যায় সহজে। বন্ধুত্বটা আসল কি মেকী, তাহা ধরিবার একমাত্র উপায় ইহাই। ইহার পরে তাহার ভদ্রতার এবং বন্ধুত্বের যাচাই করিবার আর কোনো প্রয়োজন রহিল না। একদিন তাহাকে মানুষ করিবার জন্য যে সামান্য চেষ্টা কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিয়াছিলাম—যা সকলেরই করা উচিত—তাহার জন্য সে যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও বোধ হয় তৃপ্ত হইতে পারিত না। খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আপাততঃ উদ্বিগ্ন হওয়াই হইল সার। ১৮৪০ সালে উকীল হইয়া এই দেনার শেষ কড়িটী পর্য্যন্ত শোধ করিয়াছিলাম।

এখন একেবারে রিক্তহস্ত এবং নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িলাম। ধারণা হইল, ব্যবসা আমার জন্য নয়। এই ধাক্কায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া গেল। আমার অবস্থা দেখিয়া হ্যারগুন আমাকে তাহার পল্লীভবনে পাঠাইয়া দিল। বাড়ীখানি নির্জ্জন —একখানি 'লগ্ কেবিন'। উহাতে চারিটী কুঠ্‌রী ছিল।

নির্জ্জনতার ভিতর আত্মোন্নতির যথেষ্ট সুযোগ পাইলাম। যে কোনোরূপ তপস্যার পক্ষে নির্জ্জন স্থানই প্রশস্ত, বিবেচনা করিলাম। নানারকম ইতিহাস পড়িয়া ফেলিলাম। কবি বার্ণস্ এবং সেক্সপীয়ারের অনেকাংশ মুখস্থ করিলাম। এখানে মানসিক উন্নতি কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এখানে যে সকল বই পড়িয়াছি, সহজে সে সকল স্মরণ রাখিবার জন্য প্রত্যেক বইয়েরই এক একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করিয়া ফেলিলাম। এই উপায়ে আমি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছি। ভাব ভাষা এবং রচনার সুবিধা একসঙ্গে মনের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়ায়।

এই সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। নিতান্ত নির্জ্জন স্থানে আসিয়াও তাহার হাত হইতে রেহাই পাই নাই। এক বৃদ্ধা তাহার এক পুত্র এবং আদবকায়দাদুরস্ত তিন কন্যা সঙ্গে লইয়া সেখানে দেখা দিলেন। তাহারা ভার্জ্জিনিয়া হইতে সপ্তাহ তিনেক বাস করিবার জন্য, এখানে আসিয়াছিলেন। নিউ-সালেমে দোকানদারী করিবার সময় মেয়েরা জিনিষ কিনিতে আসিলে আমি যে কি মুস্কিলে পড়িতাম, তাহা আমিই জানি। আমার মতো লোকের পক্ষে মেয়েদের সামনে চলাফেরা করা একটা সঙ্গীন্ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। এখানে ইহাদের দেখিয়া আমার আত্মা খাঁচা ছাড়িয়া যাইবার অবস্থা হইল। বৃদ্ধার কন্যা তিনটী না আসিলেই যে ভালো হইত, ইহা

বারবার শতবার আমার মনে হইয়াছিল। এই মেয়েদের হাব-ভাবে আমার শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইবার মতো হইল। বৃদ্ধার এই তিনটি কন্যার জন্যই আমি কোনোদিন তাহাদের টেবিলে বসিয়া একত্র আহার করি নাই। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিবার এবং পরিচিত হইবার ইচ্ছা আমার কোনোদিনই হয় নাই। কোনো মেয়ের সঙ্গেই বৃথা আলাপ করা আমি ভালো মনে করি না। এ পর্য্যন্ত আমি সেই নীতিই মানিয়া আসিয়াছি। সমুদয় স্ত্রীলোককে তাহাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে আমি কখনো কার্পণ্য করি নাই। আমার নিকট ইহারা যেমন এক নিতান্ত অপরিচিত ভাবের ভাবুক, আমিও তেমনি ইহাদের নিকট এক নূতন উপাদানে তৈরী জীব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিত, আমার চেহারাটা সুবিধার নয় বলিয়াই বোধ হয় আমি এরকম করি। কিন্তু সে দুর্ব্বলতা আমার কোনোদিন ছিল না।

এক আমীনের সঙ্গে এই সময়ে আমার পরিচয় হয়। ইহার নাম যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস হইতে কখনো লুপ্ত হইবে না, ভরসা করি। ইহার কলঙ্কিত জীবন এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। কান্‌সাসের পায়ে গোলামীর শিকল পরাইবার পরামর্শ এবং কৌশল বাত্‌লাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার নাম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। তাহার জরীপী-বিদ্যাটী শিখিবার জন্য আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। আমার

পক্ষে কয়েক সপ্তাহই যথেষ্ট বলিয়া, আমাকে উৎসাহ দিতেও ক্রটী করেন নাই। জরীপী সম্বন্ধে বিভিন্ন খ্যাতনামা লেখকদের রচিত গ্রন্থাদিও পড়িতে দিয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহার নিকট যথেষ্ট ঋণী। আমার জন্য তাহার এতটা দরদ দেখাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই আমীন তখন নিউ সালেম জরীপ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষার পর তিনি আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন। আমি তখন যে কোনো একটা চাক্‌রীর সন্ধানেই ছিলাম। অল্প সময়ের ভিতর এমন সুযোগ পাইয়া হাতে আকাশ পাইলাম।

জরীপী-বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জরীপী বিজ্ঞানটাও তাহার নিকট বুঝিয়া লইলাম। অতঃপর ভালো মজুরীতে যথেষ্ট কাজ আমি করিয়াছিলাম। আমার জীবনের গতি আর এক ভিন্ন এবং নূতন স্রোতে প্রবাহিত হওয়ায়, বন্ধু গ্রীনের মনটা ভাঙিয়া যাইবার মতো হইল। সে আমাকে উকীল দেখিবার জন্য ব্যস্ত ছিল না। সে দেখিতে চাহিয়াছিল, রাজনীতির গহন কাননে, সিংহবিক্রমে আমাকে চলাফেরা করিতে। আইনের এক-একটা ধারাকে সে এক-একটা ধারালো অস্ত্র মনে করিত। খুব সম্ভব, আমার সম্বন্ধে কোনো একটা বড় ধারণা তাহার মনে জন্মিয়াছিল। সেইজন্যই আইন পড়িবার জন্য সে আমাকে তাড়া দিতেছিল।

জরীপীতে হাত দিয়া, দেশবাসী আমাকে কতটা ভালোবাসে,

তাহা পরখ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। জমিজমা লইয়া বিবাদ। কেহই সহজে এক কাচ্চা জমি ছাড়িয়া দিতে রাজি নয়। আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমি যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি তাহারা তাহাতে কোনো প্রতিবাদ করে নাই, কিংবা কোনোদিন আমাকে গালমন্দ দেয় নাই। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আইনের গণ্ডী ছাড়া আমি অন্য উপায়ও গ্রহণ করিতাম।

আর পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা ভালো মনে হইল না। এবারে এই নূতন বিদ্যাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিলাম। আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর কিছু দরকার ছিল না। সঞ্চয় করা আমি কোনোদিন পছন্দ করি না। অর্থ এবং বিত্ত দুই-ই চিত্তকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়। কাহারো প্রয়োজন থাকিলে আমি বিনা মজুরীতেই খাটিয়া দিতাম। অবশ্য আমার হাতে খোরাকের পয়সা থাকিলেই তাহা সম্ভব হইত। এই ভাবে খাটিয়া যে আনন্দ পাইতাম, মজুরীর যথেষ্ট পয়সা হাতে পাইয়াও সে আনন্দ পাই নাই। পয়সার লোভে যতটুকু কাজ করিয়াছি, ভালোবাসার খাতিরে কাজ করিতে যাইয়া তাহার চেয়ে কম কিছুই করি নাই।

১৮৩৩ সালে প্রেসিডেণ্ট জ্যাক্সন্ আমাকে নিউ সালেমের পোষ্ট মাষ্টারের পদে বহাল করেন। ডাক-বিভাগটা তখন সবেমাত্র খোলা হইয়াছে। ডাকবিভাগটী একজনের ভাঁড়ার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এবং জন্মগ্রহণের পর বহু মাস

পর্য্যন্ত ঐ ঘরেই উহার শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। আমি যখন জরীপীতে অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিতাম তখন গৃহস্বামী আমার কাজটা চালাইয়া দিতেন। আমি আফিসে থাকিলে অশিক্ষিত লোকদের চিঠিপত্র পড়িয়া দিতাম। যত-গুলি খবরের কাগজ আসিত আমি তার সবগুলিই পড়িতাম। যে সকল স্থানীয় লোক সেখানে জমায়েৎ হইত, তাহারা অশিক্ষিত ছিল, কাজেই তাহাদের বিরাট মজ্‌লিসে আমি জোরে জোরে কাগজ পড়িয়া শুনাইতাম। যতগুলি কাগজ আসিত তার প্রত্যেকটী তাহারা শুনিতে পাইত। এইভাবে তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই ডাকঘরটী তখন নামে মাত্র ডাকঘর ছিল। চিঠিপত্রের আসা-যাওয়া কোনোটাই বেশী ছিল না। আমি আফিস হইতে বাহির হইবার সময় চিঠিগুলি টুপীতে গুঁজিয়া লইয়া যাইতাম। কালেভদ্রে কাহারো কখনো দুই একখানি চিঠি আসিত, সেজন্য তাহারা বড় একটা ভাবিত না। চিঠিতে জরুরী কোনো খবর থাকিত না বলিয়াই, দেওয়া-নেওয়ার কোনো তরফ হইতেই তাহারা খোঁজ লওয়ার দরকার মনে করিত না। কাজেই, এইভাবে চিঠি বিলির বন্দোবস্ত না করিলে, সময় মতো তাহাদের হাতে চিঠি পড়িবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ডাকঘরে অনর্থক চিঠি জমাইয়া রাখাটা আমি ভালো মনে করি নাই।

৯

বন্ধুবান্ধব এবং প্রাচীন ব্যক্তিদের চেষ্টায় ১৮৩৪ সালের ইলেকশনে আমি নির্ব্বাচিত হইলাম। আমি হুইগদলের সভ্য ছিলাম, তথাপি বহু ডেমোক্রাট আমাকে ভোট দিয়াছিলেন। উভয়দলের সহৃদয়তায় আমিই বেশি ভোট পাইয়াছিলাম।

এই সময়ে একজন বড় উকীলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে আইন পড়িতে বলেন। কিন্তু আমি আমার পূর্ব্ব-ধারণা হইতেই বলিলাম, উকীল হইবার পক্ষে যতখানি বিদ্যাবুদ্ধি নিতান্ত দরকার, আমার তাহা নাই। তারপর, আমার মতো দরিদ্রের পক্ষে আইন পড়িতে যাওয়া আর বাবুয়ানা করা একই রকমের হইবে না কি? ওসব যেন বাজে কথা, তিনি কিছুই শুনিতে চাহিলেন না। আমাকে পরামর্শ দিলেন, "জরীপী করিয়া তুমি যাহা পাও তোমার খাওয়া-পরা উহার দ্বারাই চলিয়া যাইবে। বই তোমার যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা আমার এখানেই পাইবে। যত বই তোমার দরকার, যতদিন ইচ্ছা রাখিতে পারিবে।" আমি তাঁহার এই কথার জবাব দিবার মতো তখন কিছুই সাম্‌নে খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বলিলাম, আপনার এই অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে আমি কোনো-দিন কিছুই দিতে পারিব, ভরসা করি না। হাসিতে হাসিতে

বলিলেন, "আমাকে তোমার কিছুই দিতে হ'বে না গো মশায়। তোমাকে ওকালতি করিতে দেখিলেই আমার পাওনা আদায় হইয়া যাইবে। তুমি কাজে লাগিয়া যাও, তোমার ভয়-ভাবনা কাটিয়া যাইবে। তোমার সুদিন আসিতে আর বেশি দেরী নাই, আমার কাছে খবর আসিয়াছে। আমার কথা শোনো, তোমার ভালো হইবে।"

রাজনীতির দিক দিয়া এই উকীল ভদ্রলোক ছিলেন ডেমোক্রাট আর আমি ছিলাম হুইগ। হুইগদলের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী ক্লে বাল্যকালে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া মানুষ হইয়াছিলেন। আমাকে শক্ত করিবার জন্য তিনি ক্লে-র জীবনী আমাকে বেশ শ্রদ্ধার সহিত শুনাইয়া যথেষ্ট ভরসা দিলেন। ক্লে-র জীবনী তাঁহার একজন বিরুদ্ধবাদীর মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম, তাঁহার স্বপক্ষের কেহ তেমনটি জানিত কিনা সন্দেহ। তারপর, আমাকে মানুষ দেখিবার জন্য যত রকমে সম্ভব সাহায্য করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, মনুষ্যত্ব যেখানে বিকাশ পাইয়াছে, দলভেদ সেখানে একটা কথার কথা মাত্র। বোধ হয় এই রকম দলভেদে মনুষ্যত্বের গৌরবই বাড়িয়া থাকে। ইঁনি যেন দলের অনেক উপরে ছিলেন। এরকম উদার চরিত্র আমি জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি। আমি তাঁহার নিকট আইন পড়িব বলিয়া রাজি হইলাম।

আমার আইন পড়ার কথা শুনিয়া সকলেই খুসী হইল।

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি খুসী হইয়াছিল গ্রীন্। এতদিনে আমার সুমতি হইয়াছে দেখিয়া, সে যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অতঃপর একদিন নিউ সালেম হইতে ২০ মাইল দূরে সেই উকীল মহাশয়ের বাড়ী যাইয়া বিস্তর বই লইয়া আসিলাম।

১৮৩৬ সালে আমার নির্ব্বাচকমণ্ডলী আমার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ দ্বিতীয়বার আমাকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। এই সময়ে আমি গোলামী-প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত আন্দোলন সুরু করি। এই আন্দোলনের পক্ষপাতীরা সফলতার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিল। পুস্তিকা ছড়াইয়া, বক্তৃতা দিয়া, দাসত্বের বিষময় ফল লোককে বুঝাইয়া দিয়া, যত রকমে সম্ভব আন্দোলনকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিল। ইউনিয়নের উত্তর অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহও এই আন্দোলনকে দাবাইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। দাসত্ব-প্রথার বিরোধীরা যে গরু-চোরের চেয়েও জবরদস্ত জীব, ম্যাসাচুসেট্স এবং নিউইয়র্কের দুই গবরনরই, এই মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। ইলিনয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধ-মত প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিল। এই আন্দোলনের এক নেতা ছিলেন পাদ্রী লাভজয়। তিনি নিজের ছাপাখানার সাহায্যে কাগজ ছাপাইয়া দেশময় ছড়াইতেছিলেন। দাসত্বের পক্ষপাতীরা তাঁহার ছাপাখানা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিল। এইরূপ প্রেমিক পুরুষদের আত্মদানেই, সত্য ছড়াইয়া

পড়িবার সুযোগ পায়। এইরূপ নিষ্কাম মৃত্যুই কলুষিতচিত্ত পবিত্র করিয়া থাকে।

ইলিনয়ের রাষ্ট্রদরবারে এই সময়ে ডেমোক্রাটদের সংখ্যা ছিল বেশি। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গোলামীকে কায়েম করিবার জন্য বিরুদ্ধ-বাদী 'এবোলিশনিষ্ট'দের বিপক্ষে তাহারা কড়া আইন জারি করিতে লাগিয়া গেল। তাহারা এবোলিশনিষ্টদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন এবং চাবুকের ভয় দেখাইতেও কসুর করে নাই। এইভাবে চলিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। একে একে এবোলিশনিষ্টরা ভালো মানুষ সাজিতে লাগিয়া গেল। একমাত্র আব্রাহাম্ লিঙ্কল্‌ন্‌ই সেদিন বেতের এবং তর্জ্জন-গর্জ্জনের ভয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে বিসর্জ্জন দেয় নাই। আমি দাসত্বের পরিপোষক সকল আইন উড়াইয়া দিলাম, এবং যাহারা ঐ সকল আইনের কর্ত্তা তাহাদের ঐরূপ আইন করিবার অধিকার নাই বলিয়া, প্রতিবাদ করিলাম। দরবারে আমি তখন একলা একদিকে, তথাপি আমার ভয়ের কোনো কারণ সেখানে ছিল না। লিঙ্কল্‌ন্‌কে ভয় দেখাইতে পারে, এমন লোক এ পর্য্যন্ত দুনিয়ায় জন্মে নাই, আর অতঃপর জন্মিবেও না। আমি দীর্ঘকাল যাবৎ এই দুর্ব্যবহারের প্রতিকারের সুযোগই খুঁজিয়া আসিতেছিলাম। কাজেই, সেদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও সেখান হইতে আমাকে এক-পা হটাইতে পারিত

না। যেদিন এই প্রতিকারের ইচ্ছা প্রাণে জাগিয়াছিল সেদিন আমি দলবদ্ধভাবে ইহার ব্যথাটা অনুভব করি নাই, কিংবা জট্‌লা করিয়া উহার প্রতিকারের উপায় খুঁজিতেও বসি নাই। কাজেই, একলা বলিয়া আমার চিন্তিত হইবার কোনো কারণ ছিল না। মনুষ্যত্বের এই শেষ পরীক্ষায় আমি যেমন পেছনে পড়িয়া থাকিতে চাহি নাই, অপরেও তেমনি পেছনে পড়িয়া থাকে, ইহাও আমি ইচ্ছা করি নাই। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, তাহা করিতে মানুষে কেন ভয় পাইবে! একমাত্র সত্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াই মানুষ পশুস্তরের ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে। সেই মানুষের ভিতর যখনই ইহার ত্রুটী দেখি, তখনই আমার দুঃখ হয়।

এই দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে যাহারা অভিযান করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই হৃদয় দিয়া যেমন বিষয়টাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারেন নাই, বুদ্ধি দিয়া তেমনি উহাকে বিচার করিয়াও লইতে পারেন নাই। এই বিরুদ্ধতায় কি কি বাধা-বিপত্তি আসিতে পারে তাহা তলাইয়া বুঝিবার মতো মস্তিষ্ক তাহাদের ছিল না। কাজেই, এই রকম লোকের পক্ষে বিপদকালে প্রাণভয়ে পলাইয়া যাওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই সময়ে ডান্‌ষ্টোন্ মহাশয় আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের দুই জনের সেদিনের বন্ধুত্ব, মিত্রতা এবং সৌহৃদ্য আজিও অটুট রহিয়াছে। বিপদের আগুনে পুড়িয়া যে পরিচয়টা পাকা হয়, ছোট বড় শত আঘাতেও তাহা ভাঙ্গিয়া যায় না। স্বার্থের খাদটা দূর

হইয়া গেলেই সকল ভয় দূর হইয়া যায়। পরম নির্ভীক ডান্‌ষ্টোন মহাশয়কে পাইয়া আমি একজন খাঁটী সহকারী লাভ করিয়াছিলাম।

যখন ডেমোক্রাটরা নিজেদের সুবিধার দিক দিয়া নানা রকম আইন মঞ্জুর করাইয়া লইল, তখন "অন্যায়" এবং "দুর্নীতি" বলিয়া আমরা দুই জনেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এবং সরকারী গেজেটে আমাদের নামের পাশে আমাদের মন্তব্যও প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমাদের আন্দোলনের ফলে ডেমোক্রাটরা গর্জ্জিয়া উঠিয়া যখন মানুষের ব্যথা-বেদনার তীব্র আর্ত্তনাদকে খর্ব্ব করিয়া দিতে চাহিল, তখন পবিত্র যুবকচিত্ত—শহরে-গ্রামে, ইস্কুলে-চাষের জমিতে, কামারশালে-ছুতারমিস্ত্রীর কারখানায়, মুদির দোকানে এবং তাড়িখানায়—যে যেখানে ছিল পাগলের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। বুঝিলাম, আমার ডাক ব্যর্থ হয় নাই। মানুষের প্রাণ যেখানে যেখানে আছে, এই ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসিবেই, এই বিশ্বাস আমার ছিল। তাহারা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, লক্ষ লক্ষ নিগ্রো বাঁচিবার জন্য তাহাদিগকে কাতরে ডাকিতেছে। আমার বিশ্বাস, সেইদিন এই সকল নির্ভীক কর্ম্মীরা, কেবল সুযোগের অপেক্ষায় যেখানে সেখানে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল। এই সকল যুবক জগতের গৌরব। মানব-সমাজে যখন মনুষ্যত্বের ত্রুটি ঘটে তখন, "পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায়

চ ডুক্কতান্”, এই রকম শত শত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যুবক কি ভাবে কোথা হইতে আসিয়া মিলিত হয়, তাহা সাধারণের পক্ষে বুঝা শক্ত।

ডেমোক্রাট সরকারের ভয়ে লোকেরা মাথা তুলিতে সাহস করিতেছিল না সত্য, কিন্তু ১৮৩৮ এবং ১৮৪০ সালে, তৃতীয় ও চতুর্থবারে—প্রবল আন্দোলনের সময়—তাহারা আমাকে নির্ব্বাচন করিতে একটুও ভয় পায় নাই।

১০

১৮৩৭ সালে আইন পাশ করিয়া কিছুদিন আমার উৎসাহদাতার সহকারী হিসাবে কাজ শিখিলাম। সেখানে থাকার সময় আইনের দিক দিয়া লোকদিগকে যে সব সাহায্য করিয়াছিলাম, তাহার জন্য কোনো পয়সা লই নাই। ঐ সকল কাজে পয়সা না আসিলেও আমার উপকার হইয়াছিল অনেকখানি।

আমি যখন ওকালতি আরম্ভ করি তখন আমার এমন অবস্থা ছিলনা যে, একটা ঘোড়া এবং সাজ-সরঞ্জাম খরিদ করিতে পারি। এই ঘোড়া এবং সাজ-সরঞ্জামের অভাব মিটাইয়াছিলাম, কিছুকাল ওকালতি করিবার পর।

সে সময়ে কোনো নির্দ্দিষ্ট আদালত-ঘর ছিল না! বিচার-পতিরা মণ্ডলে-মণ্ডলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচার করিতেন। কাজেই, উকীলরাও বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন। এইজন্যই ঘোড়ার প্রয়োজন হইত।

ওকালতি সুরু করিবার পূর্ব্বে, ইহার অপবিত্রতার কথা যতটা আমার শোনা ছিল, কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া দেখিলাম, ইহা ততোধিক অপবিত্র এবং দুর্গন্ধময়। একদিন এক মক্কেল আসিলেন, উকীলকে টাকা দিয়া অনাথা বিধবার যথাসর্ব্বস্ব

আত্মসাৎ করিবার মতলবে। মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়াই মক্কেলকে হাকাইয়া দিলাম। অতঃপর এক মোকদ্দমা আসিল, জোচ্চুরির। আমার মক্কেলের নিকট মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, লোকটী সত্য বলিতেছে। মিথ্যা মোকদ্দমা আমি গ্রহণ করি না, একথা আমার সকল মক্কেলকেই বলিয়া দিতাম। কাজেই, আদালতে যখন প্রমাণ হইল আমার মক্কেলই জোচ্চোর, তখন আর আমি মোকদ্দমা চালাইলাম না। আমাদের এই ব্যবসা আমরা দুই-তিনজন একত্র হইয়া চালাইতাম। একদিন এক খুনী-মোকদ্দমার ভার লইবার পর নথিপত্র উল্টাইয়া দেখিলাম, আসামী দোষী। আমি আমার সহকর্ম্মীর উপর মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিলাম। আমি ইহাতে কোনো সাহায্য করি নাই, এবং ইহার এক দামড়িও আমার পকেটে যায় নাই। আমার নীতির সঙ্গে অধিকাংশ উকীল-ব্যারিষ্টারের নীতিই খাপ খাইবে না। সাধারণতঃ উকীলরা দোষী আসামীকে বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়াই যশস্বী হইয়া থাকেন। ইহাতে যথেষ্ট কাঁচা পয়সার মুখ দেখার সুবিধা হয়। যে নির্দ্দোষ ব্যক্তি বিপন্ন হইয়াছে, তাহাকে ত্রাণ করিবার জন্যই আমি উকীল-ব্যারিষ্টারের দরকার, মনে করি। উকীলের এবং চিকিৎসকের এইভাবে প্রশ্রয়দানের ফলেই জগতে অনেক দুর্নীতি নিজেদের পীঠস্থান করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ পাপ করিলে তাহাকে শাসাইবার জন্য হয়ত একজনও অপেক্ষা করে না, কিন্তু তাহাকে সাহায্য

করিবার জন্য শত শত লোকের মাথা ব্যথা হয়। যদি এই সকল ব্যবসায়ীরা সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া ব্যবসায়ে লাগিতেন, তাহা হইলে জগতের আব্‌হাওয়া আজ বোধ হয় এতটা কলুষিত হইত না। দিনের পর দিন, নানা রকমের পাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাগতিক দিক দিয়া নানা ভাবে সর্ব্বস্বান্ত লোককে হয়ত অনেকেই ডাকিয়া আশ্রয় দিবে, কিন্তু যখন কোনো লোক চরিত্র হারায় তখন আর তাহার এমন কোনো মূলধন থাকে না, যাহার লোভ দেখাইয়া সে অপরের বাড়ীর ফটক পার হইতে পারে। সেইজন্যই আমি চাহি নাই, কোনো লোক আঙুল দিয়া দেখাইয়া ঐরূপ উকীল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজের দলে আমাকে ফেলিয়া দেয়। চরিত্রহীনতার ফল কখনো ভালো হয় না, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

একদিন অপরাহ্নে এক বৃদ্ধা নিগ্রো রমণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার আফিসে হাজির হইলেন। তখন আমি ও হ্যারন্‌ডন্ আফিসে ছিলাম। বৃদ্ধা বলিলেন, তিনি এবং তাঁহার পুত্র-কন্যারা কেন্‌টাকীতে গোলামী করিতেন। এখন ইলিনয়ে পলাইয়া আসিয়া তাঁহারা স্বাধীন হইয়াছেন। বৃদ্ধার এক পুত্র জাহাজে চড়িয়া নিউ অর্‌লিন্‌সে গিয়াছিলেন, সেখানে পারে উঠিতেই পলাতক গোলাম বলিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তখন এই রকম পলায়িত নিগ্রোদিগকে ধরিতে পারিলে তাহাদের মনিবদের হাতে সমর্পণ অথবা বিক্রয় করিবার রাষ্ট্রীয় বিধি ছিল।

সমুদয় বিষয়টা শুনিয়া লইয়া হ্যারন্‌ডনকে গবরনরের নিকট পাঠাইলাম, ইহার কি প্রতিকার হইতে পারে, জানিবার জন্য। জবাব যা পাইলাম তার অর্থ এই যে, এই ব্যাপারে হাত দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা গবরনরের না-থাকায় তিনি বিশেষ দুঃখিত। রাজপুরুষদের এই রকম খাম-খেয়ালী দেখিয়া অন্তরটা জ্বলিয়া যাইতেছিল। যদি কেহ টাকা দিয়া উদ্ধার না করে তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাকে গোলামের বাথানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, এই ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্য যে পলাইয়া আসিয়াছে, আবার তাহাকে অত্যাচারের গারদে পাঠাইবার কথা ভাবিতেই আমার অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। আর দেরী না করিয়া নিউ অর্‌লিন্‌সে টাকা পাঠাইয়া দিয়া নিগ্রো ছেলেটীকে উদ্ধার করিলাম।

সেদিনে নিগ্রো-সমস্যাই ছিল আমেরিকার বড় সমস্যা। খৃষ্টানদের অনেক রকম দৈন্য ছিল সত্য, তথাপি স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করিবার দাবীটুকু তাহাদের ছিল। কিন্তু এই হতভাগারা বিদেশে বিভূঁয়ে সকল রকমে কাঙ্গাল হইয়াই পলে পলে জীবনটাকে শেষ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। বেশি বেশি শিক্ষিত, এবং মোটা মোটা মাহিনার চাকুরীয়াদিগকে পরার্থে অনেক বড় বড় কথা বলিতে শোনা গিয়াছে, কিন্তু কার্য্যকালে ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনে হইত, ইহারা নিগ্রোদের চেয়ে অনেক হীন প্রকৃতির। অশিক্ষিত এবং অসহায় নিগ্রো আত্ম-চৈতন্যের অভাবে বাধ্য হইয়া গোলামী করিতেছিল, আর

শ্বেতাঙ্গরা শিক্ষা-সম্মান, বড় বড় চাকুরী, এবং বড় বড় পদলাভ করিয়া গোলামীর আর এক নূতন স্তরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুইয়ের ভিতর তফাৎ এই—নিগ্রো অশিক্ষিত, দুর্ব্বল, নিজের স্বার্থরক্ষায় অজ্ঞ, আর ইহারা সবল, নিজেদের স্বার্থরক্ষায় হুশিয়ার, শিক্ষিত। নিগ্রো মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল না বুঝিয়া, আর ইহারা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল শিক্ষাকে বদ হজম করিয়া।

ফৌজদারী মোকদ্দমার দোষী আসামীকে ত্রাণ করিয়া উকীল যে গৌরব লাভ করেন, বিপন্ন নির্দ্দোষ আসামীকে রক্ষা করিয়াও সে আনন্দ পাওয়া যায়। এক সময়ে নিউ সালেমের এক বন্ধুর গৃহে আমি অনেকদিন কাটাইয়াছিলাম। বন্ধু-পত্নীর যত্নে আমার খাওয়া-দাওয়ার যেমন সুবিধা হইয়াছিল, ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ের মেরামতিতেও তেমনি কোনো ত্রুটী হয় নাই। এই সময়ে আমার বন্ধুটীর মৃত্যু হইয়াছিল। হঠাৎ এক-দিন খবর পাইলাম, তাহার বিধবা স্ত্রী লিখিয়াছেন তাহার এক-মাত্র পুত্র কুসঙ্গে মিশিবার ফলে এক খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছে। মা-র বিশ্বাস তাঁহার ছেলে নির্দ্দোষ। ছেলে শত অপরাধে অপরাধী হইলেও কোনো মা-ই বোধ হয় তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে না। যাহা হোক, আমি বন্ধু-পত্নীর কথার উপর নির্ভর করিয়া মোকদ্দমার ভার লইলাম। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সুবর্ণ সুযোগ সামনে পাইয়া আমি যারপরনাই সুখী হইয়াছিলাম।

মোকদ্দমা খুবই জটিল। সাক্ষীরা একে একে বলিতে লাগিল, আমার মক্কেলই খুন করিয়াছে। বিচারক হইতে দর্শক পর্য্যন্ত সকলেই আমার মক্কেলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই এক্ষেত্রে খুব হুশিয়ার হইয়া চলা দরকার মনে হইল। এক চুল এদিক-ওদিক হইলেই বিপদ। আমি এক সাক্ষীকে জেরা করিলাম,—

—"তখন রাত্রি কত ?"

—"দশটা কি এগারোটা।"

—"সময়টা ঠিক করিয়া বলুন ?"

—"সাড়ে দশটার বেশি নয়।"

—"তখন অন্ধকার ছিল কি ?"

—"খুব পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল।"

আপনাদের বুঝিবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট হইবে। আমি বিচারককে বুঝাইলাম, সে রাত্রিতে দশটা হইতে এগারোটার ভিতর চাঁদ উঠে নাই। কাজেই মোকদ্দমা যে মিথ্যা ইহা বলা বাহুল্য। সমুদয় আদালত-ঘর তখন নীরব। সকলেই একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা কল্পনা করিতেছিল। এই রকম একটা যুক্তি কেহ ধারণাই করিতে পারে নাই। আমার আসামী খালাস পাইয়া গেল।

পয়সার মালিক হইবার জন্য আইন শিক্ষা করিব না, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। জীবনে কোনোদিন আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই। নিজের চরিত্র নিজে কলুষিত না

করিলে, এবং চরিত্র কলুষিত হওয়ার পরও উহাকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবৃত্তি না থাকিলে, অপরের দ্বারা কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপের পথে পা দিয়া যদি একবার কেহ সফল হয়, তাহা হইলেই বিপদ। তখন পাপকে পাপ বলিয়া বিচার করিবার ইচ্ছা হয় না, আর সে ক্ষমতাও লোপ পায়।

মোকদ্দমার জন্য যখন ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তখনও ঘোড়ার পিঠে বসিয়াই আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতাম। পুঁথি-পত্র সবই আমার সঙ্গে থাকিত, সময় পাইলেই পড়িতাম। চলার পথে লোক পাইলে তাহাদিগকে বিখ্যাত গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতাম। তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। এইভাবে জগদ্বিখ্যাত কবিরা, আমেরিকান্ জঙ্গলের সাত-পুরুষে' মুর্খের নিকটও, পরিচিত হইয়া পড়িতেছিলেন।

১১

ইলিনয়ের জনসাধারণ আমার প্রতি তাহাদের গভীর বিশ্বাসের এবং ভালোবাসার আর একবার প্রমাণ দিল- ১৮৪৬ সালে রাষ্ট্র-দরবারের জন্য আমাকে হুইগ-সভ্য মনোনীত করিয়া। সেই সময়ে ডেমোক্রাট দল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, ষ্টিফেন ডগ্‌লাস্‌।

দেশ তখন ভয়ানকভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণের গোলাম-মনিবরা টেক্‌সাস্‌কে নিজেদের এলাকাভুক্ত করিয়া আনন্দ করিতেছিল। এদিকে, মেক্‌সিকো জয় করিয়া সেখানেও আর একটা গোলামখানা করিবার মতলবে তাহারা ছিল। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। এক্‌লাই এই গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিলাম। যে দুই বৎসর আমি রাষ্ট্র-দরবারে ছিলাম, সেই দুই বৎসর কি আমার মতবাদী কি বিরুদ্ধবাদী কেহই সুখে ঘুমাইতে পারে নাই। আমি দেশের যে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলাম, এই সময়ে তাহা সফল হয়। ওহায়োর জনকয়েক লোককে স্বাধীনতার যোদ্ধারূপে পাইয়া আমি দ্বিগুণ শক্তি বোধ করিতেছিলাম। গোলামীর বহর যে রকম বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে সেদিন যে কোনো বিদেশী মনে করিতে পারিতেন,

আমেরিকা গোলামের দেশ। গোলামী-মনোবৃত্তিই আমেরিকার ভাবদৌলত। জনকয়েক শ্বেতাঙ্গ ধনী লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে নিজেদের ব্যবসায়ে খাটাইয়া মনিবি করিতেছে; উহাদের গায়ের তেল বাহির করিয়া নিজেরা পুষ্ট হইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই প্রথা চলিতে থাকিলে আমেরিকা জগতের বুকে মানুষ দাঁড়-করাইতে পারিত না। এক-আধজন জর্জ্জ ওয়াশিংটনের গৌরব একটা কথার কথা হইয়া থাকিত মাত্র।

স্বার্থের বন্ধন আমার ছিল না বলিয়াই, দরবারে আমাকে ভয়ে ভয়ে কোনো কথা বলিতে হয় নাই। ওয়াশিংটনের দরবারে আমার কোনো প্রয়োজন ছিলনা, আমার প্রয়োজন ছিল আমেরিকার কাছে। আমি বক্তৃতা দিয়া বাহবা পাইবার জন্য লালায়িত ছিলাম না—আমি ছিলাম, অবনত নির্য্যাতিত বিরাট-কায় নিগ্রো-সমাজের মুক্তির চেষ্টায়। দরিদ্রের, লাঞ্ছিতের, পরাধীন গোলামের জীবনেও যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সুযোগ পাইলে সে-ও যে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এই সত্যটা ধনী শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলাম। ভগবানের সৃষ্ট এই ধনীরা সেদিন নিজে-দের স্বার্থের জন্য যেভাবে নূতন নূতন আইন তৈরী করিয়া গোলামীকে পাকা করিবার ফিকিরে ছিল, ভগবান যদি তখন নিজে একবার আমেরিকার মাটীর উপর দিয়া বেড়াইয়া যাইতেন, তাহা হইলে ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আৎকাইয়া উঠিতেন, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পর পর দুইবার দেশবাসীর অনুরোধ রাখিতে পারি নাই। নির্ব্বাচনে আর দাঁড়াইলাম না। ভাবিয়া দেখিলাম, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য ঠিক ঠিকভাবে তৈরী হইতে হইলে আমার আরো জ্ঞানলাভ আবশ্যক। তখন দরবারের সভ্য যাঁহারা ছিলেন, জ্ঞানের দিক হইতে মাপিয়া জুখিয়া দেখিলাম, তাঁহাদের অনেকেই আমার চেয়ে অনেক উঁচু। কাজেই, ওয়াশিংটন পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী ও আমেরিকান সাহিত্য, এবং ভাষা-শিক্ষার জন্য নামজাদা লেখকদের রচনা এবং রচনা-পদ্ধতি চর্চ্চা করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পর আমার মানসিক উন্নতি বুঝিতে পারিলাম। "যতকাল বাঁচি ততকাল শিখি" এই নীতি আমি সকল সময় পালন করিয়া থাকি। এই সময়ে পরিবারের সঙ্গে থাকিয়া স্প্রীংফিল্ডে ওকালতি করিতেছিলাম।

রাজনীতির আসর হইতে দূরে সরিয়া গেলাম সত্য, কিন্তু ডেমোক্রাটদের চেয়েও বড় শত্রু মদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার কার্য্য চালাইলাম। ১৮৫৪ সালে বাধ্য হইয়া, আবার রাজনীতির ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই সময়ে মিসৌরী এবং কান্সাসে গোলামী চালাইবার জন্য জোর চেষ্টা চলিতেছিল। ডেমোক্রাটরা মিসৌরী-চুক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহার অর্থ, কান্সাস্ ও নেব্রাস্কার পায়ে শিকল পরানো। আর চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, ডগ্লাস্। সকল দিক লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের

রাজনীতি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। "শুভস্য শীঘ্রম্‌।"

ডগ্‌লাস্‌ যে স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ডেমো-ক্রাটদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সেইস্থানে একদিন এক বক্তৃতা দিলেন। হাজার হাজার লোক সেদিন তাঁহার সুন্দর সুন্দর কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন আমি এই গোলামীর বিরুদ্ধে সেইখানেই এক বক্তৃতা দিলাম। কান্‌সাস্‌ এবং নেব্‌রাস্‌কার গোলামী কোনো লোকই সমর্থন করিল না। এই সভায় নারীরা ঘন ঘন রুমাল উড়াইয়া আমার বক্তৃতা সমর্থন করিয়াছিলেন। আমার আকুল প্রার্থনা এতদিনে দেশ মঞ্জুর করিল দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম।

অতঃপর ডগ্‌লাস্‌ আরো কয়েক স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমি সকল স্থানেই তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এই প্রতিবাদের ফলে সমুদয় ইলিনয় যেন দীর্ঘকালের ঘুমের পর জাগিয়া উঠিল। তাহার অনেক কিছু জানিবার, শুনিবার এবং বুঝিবার ক্ষুধা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। এতদিন ইলিনয়ে ডেমোক্রাটদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এইবারে সেই তাসের ঘর উড়িয়া যাইতে চলিল। হুইগ-দল গঠিত হইয়া গেল। সমুদয় দেশ তখন উত্তেজনায় টগ্‌ বগ্‌ করিতেছিল। কান্‌সাসে এবং নেব্‌রাস্‌কায় গোলামী রহিত করিবার জন্য অনেক ডেমোক্রাট রিপাবলিকানদের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন।

তর্কযুদ্ধে ডগ্‌লাসের উপর জয়ের চেয়ে এইভাবেই চরিত্রের শক্তিটা প্রমাণিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কান্‌সাস্ ও নেব্‌রাস্‌কা লইয়া ডেমোক্রাটদের ভিতরে দলাদলি সুরু হয়। হুইগদলের পক্ষ হইতে ছিলাম আমি, এবং দুই মতের দুইজন ডেমোক্রাটও কংগ্রেসের পদপ্রার্থী ছিলেন। ডেমোক্রাটদের ভিতর, কান্‌সাস্ ও নেব্‌রাস্‌কায় গোলামীর বিরোধী ব্যক্তিকে, আমার পরিবর্ত্তে ভোট দিবার জন্য ভোট-দাতাদিগকে অনুরোধ করিলাম। তাহারা আমাকে পাঠাইবার জন্যই আমার কথা শুনিতে চাহিল না। উন্মত্ত জনতার শক্তি ও দৌর্ব্বল্য কোথায় থাকে তাহা আমার জানা আছে। কাজেই, তাহারা জোর প্রতিবাদ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। আমার এই ব্যাপারে ইহারা অনেকেই দুই চারি ফোঁটা স্নেহের অশ্রু ফেলিয়াছিল। অনেকেই সেই-দিন হইতে আমাকে তাহাদের আরো নিকট বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিল, একটা ভোটের জন্য প্রার্থীরা, ঘুষ্ দিয়া, মদ খাওয়াইয়া কত কাণ্ডই না করে, আর তুমি মুঠার ভিতর তোমার চরম জয় জানিয়াও তাহা অপরের জন্য ত্যাগ করিলে! একজন বলিল, আমরা ঠিক জানি, তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্যই ইহা ধূলির মতো উড়াইয়া দিয়াছ। আমার জবাব দিবার মতো কিছুই ছিল না। শুধু বলিলাম, তোমাদের এই বিশ্বাসের জোরেই নিগ্রোজাতির মুক্তি এবং আমেরিকার প্রকৃত সম্মান লাভ হইবে।

প্রবল পরাক্রান্ত ডেমোক্রাটদের অধঃপতনের দিন ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। প্রবল যখন দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে দৈহিক বলের বড়াই করে, তখনই বুঝিতে পারা যায়, সে মানসিক বল কতখানি খোয়াইয়াছে। চরিত্রবল লোপ পাইলেই পশু-শক্তির বিকাশ হয়। ডেমোক্রাটরা ভোগতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তার ধার ধারিত না। স্বার্থের দ্বারা ইহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া গিয়াছিল। নিজেদের চরিত্রগত দোষ-ত্রুটী শোধ্‌রাইবার চেষ্টা না করিয়া, রিপাবলিকানদের দোষ দেখাইয়াই উহারা মনে করিয়াছিল, নিজেদের ঘরের আগুন নিবাইয়া ফেলিবে। সত্যকার দোষ দেখাইলে আমি তাহা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতাম। মনের ততটুকু জোর আমার চিরদিনই আছে। কিন্তু ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রিপাব্‌লিকান-দিগকে হেয় করা। কোন্ রিপাবলিকান্-নেতা কবে ছেঁড়া-জামা গায়ে দিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিল, কার বাপ-ঠাকুরদাদা কবে লাঙ্গলের মুঠি ধরিয়া ধরিয়া হাত শক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, ইত্যাদি অকেজো বিষয় লইয়া নিজেদের দলের ভিতর মোড়লী করিতেছিল। আমি জানিতাম, আজিকার মতোই ইহারা কর্ত্তৃত্ব করিয়া যাইতেছে, হয়ত আগামী কল্য যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইবে। উহারা যে ক্রমে ক্রমে বেড়াজালের ভিতর পড়িয়া প্রাণ দিতে বাধ্য হইবে, তাহাই আমার সর্ব্বদা মনে হইত। নির্য্যাতিত নিগ্রোদের দীর্ঘশ্বাস যে ইহাদিগকে পুড়াইয়া মারিবে, সে বিষয়ে আমার কোনোই

সন্দেহ ছিল না। এইসব জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া আরো দিন কতক দলটাকে খাড়া রাখিতে পারিয়াছিল, তারপর ধীরে ধীরে ভাঙ্গন ধরিল। অনেক ডেমোক্রাট সোজাসুজি রিপাবলিকানদের সঙ্গে মিলিয়া গেল। গরীব রিপাবলিকানদের চরিত্রবলই ছিল সেদিন একমাত্র সম্পদ।

কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, কান্‌সাসে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিবে, মিসৌরী-চুক্তি-ভঙ্গ লইয়া উত্তর ও দক্ষিণে দাঙ্গা হইবে, এবং কান্‌সাস্-নেব্‌রাস্‌কায় খুনোখুনি চলিতে থাকিবে। কথাগুলি একে একে সত্য হইয়া গেল। সীমান্তের গুণ্ডারা ডেমোক্রাটদের টাকা খাইয়া, রিপাবলিকানদের ঘর পুড়াইয়া এবং লুঠতরাজ করিয়া, কান্‌সাসের লোকের মনে স্বাধীনতার নামে ভয় জন্মাইয়া দিতেছিল। কান্‌সাস্-নেব্‌রাস্‌কায় যে আগুন জ্বলিয়াছিল, বুদ্ধিমান্ ডেমোক্রাটরা তাহা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, সেই আগুনেই তাহাদের গোলামের বাথান জন্মের মতো পুড়িয়া যাইবে।

এই সময়ে এক সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া, আমেরিকার রাজনীতির গতি কোন্ দিকে, বলিয়া ফেলিলাম। উদ্দেশ্য, দুই দিন পরে যাহা ঘটিবেই, তাহাকে চাপিয়া রাখিয়া কোনো ফল নাই, বরং পূর্ব্বে জানিতে পারিলে জনসাধারণ চিন্তা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। সেই বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম, "গৃহবিবাদই সর্ব্বনাশের কারণ। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, যেখানে অর্দ্ধেক স্বাধীন, আর অর্দ্ধেক গোলাম, সে গবরমেণ্ট কখনো চিরস্থায়ী হইতে পারে না।"

বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে জনকয়েক বন্ধুকে প্রবন্ধটা দেখাইলাম। তাহারা প্রবন্ধটা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন। কেহ বলিলেন, "বেকুফ," কেহ বলিলেন, "জনমতের ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হচ্ছে," একজন বলিলেন, "এবারে নিজেও ডুবিবে আর রিপাবলিকান-দিগকেও ডুবাইবে।" যার যা মনে আসিল সে তাই বলিয়া যাইতে লাগিল। একমাত্র হ্যারন্ডনই আমার প্রবন্ধটী সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাকে বলিলাম, গৃহবিবাদ যে পরস্পরকে শক্তিহীন করে, এই অতি পুরাতন সত্য কথাটা ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীনেরাইতো বলিয়া গিয়াছেন। আমি সেই পুরাতন কথাটাই দেশকালপাত্র অনুসারে আজ আবার আবৃত্তি করিতেছি মাত্র। আমি যাহা লিখিয়াছি, ঠিক তাহাই পড়িব। লোকমতের খাতির রাখিয়া চলিতে আমি শিখি নাই। সে শিক্ষা থাকিলে আজ আমি এই প্রবন্ধ না-লিখিয়া আর দশজনের মতোই নির্ব্বিবাদে জীবন কাটাইতে পারিতাম। আমেরিকার বুকের উপর যে অশান্তি আনিয়াছি, আমি জানি, গোলাম-মনিব, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালা, নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ কেহই তাহাতে সুখী হয় নাই। এতদিন সকলেই সুখে-দুঃখে জীবনটাকে একভাবে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, হঠাৎ এ অশান্তিটা কোনো পক্ষই পছন্দ করিতে পারে না। সুখী যেমন সুখের পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না, গোলামও তেমনি গোলামীর পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না। সুখীর এই অযথা আড়ম্বর এবং গোলামের এই মিথ্যা শান্তি ও মিথ্যা

আনন্দবোধ দূর করিবার জন্যই, রিপাব্লিকানরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই অশান্তির আগুনে হয় রিপাবলিকানদের উদ্দেশ্য পুড়িয়া যাইবে, আর নয়ত শ্বেতাঙ্গের সুখ-শান্তি-আশা পুড়িয়া ছারখার হইবে। এই মুষ্টিমেয় দুর্ব্বল রিপাবলিকানদের চরিত্রবল অটুট থাকিলে এই অগ্নি-পরীক্ষায় সে অক্ষত থাকিয়া যাইবেই, তাহার ধ্বংস অসম্ভব।

আমার প্রয়োজন সাধনের জন্য লোকমতের সাহায্য আবশ্যক সত্য, কিন্তু তাহাদের সাহায্য না পাইলেও আমার ভাবিবার কিছুই নাই। আমার উদ্দেশ্য এত প্রবল যে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি একযোগে সমুদয় আমেরিকার নাই। এই মত প্রচার না করিয়া ইলেকশনে বেশি ভোট পাওয়ার চেয়ে, এই মত প্রকাশ করিয়া পরাজিত হওয়াও আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। আমি এক ইঞ্চি পিছু হটিব না। হ্যারন্ডন বলিলেন, "ঠিক কথা"। তাঁহার কাছে একটা কথা শুনিয়া আমার শক্তির সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি বলিলেন, "শক্তিমান কর্ম্মীরাও সময়ের অপেক্ষা করে—বলিয়া একটা কথা চলিত আছে সত্য, কিন্তু নিজেদের ইচ্ছামতো সময়কে টানিয়া হিচ্ড়িয়া কাছে আনিয়া নবযুগের সৃষ্টিও করে আবার তাহারাই। তুমি পিছু হটিলে আমেরিকা আরো ৫০ বৎসর পিছাইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। নির্য্যাতিত দাসদের ভাগ্য আরো দীর্ঘকালের জন্য মনিবদের পায়ের উপর লুটাইতে থাকিবে। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধের

চেয়েও বড় হইবে তাহার মনুষ্যত্ব লাভের যুদ্ধ। তুমি পিছু হটিও না। দাসজাতির মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত তোমার পরাজয় কোথাও নাই। শত বিরুদ্ধ শক্তিও তোমাকে হটাইতে পারিবে না। পরাধীনের, নির্য্যাতিতের মুক্তির প্রয়োজনেই তোমার জন্ম। তোমার বন্ধু স্থানীয় ইহারা তোমাকে যেমন বাধা দিতেছে; আমরাও তোমার বন্ধু, তোমাকে আগাইয়া দিবার দাবী তেমনি আমাদেরও আছে।" এই কথায় সেদিন আমি যে কত আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা আজ আর কি বলিব! সেদিনের ব্যর্থতা যেন আজিকার জয়ের চেয়েও মধুর ছিল।

আমি আমার বিরুদ্ধমতের বন্ধুদিগকে বলিলাম, "আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছি। সকল দিক হইতেই ইহার দোষগুণ বিচার করিয়াছি। লাভক্ষতির অঙ্কটাও হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, এখনই এইকথা সর্ব্ব সমক্ষে খুলিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে। যদি আমাদের মুমূর্ষু অবস্থা সম্বন্ধে সত্যকথা বলার জন্যই আমার পতন হয়, তাহা হইলে তাহাতে তোমাদের আপত্তি না করাই উচিত। কারণ, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়িয়া জীবন দেওয়াই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।

আবার যাহার যাহা মনে আসিল সে তাহাই বলিতে লাগিল। আমি তখন ধীর, স্থির, নির্ব্বাক। কোনো কথা বলার দরকার মনে করি নাই। তাহাদের ক্ষমতা ছিল শুধু গর্জ্জন করিয়া প্রতিবাদ করিবার। তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া-

ছিল, পিছু হটিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদ করিবার জন্য। তাহাদের না-ছিল প্রাণভরা আশা, না ছিল চিন্তা করিবার শক্তি। ন্যায়-ধর্ম্মের কোনো বোধ ছিল না,ছিল শুধু প্রাণের ভয়ে অগ্রবর্ত্তীকে পেছনে টানিয়া রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা। বক্তৃতা পড়া হইয়া গেলে কি শত্রু কি মিত্র, কি নিজমতের কি পরমতের, সকলেই একটা অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। একজন খ্যাতনামা সদস্য আমাকে বলিলেন,"বিষয়টাকে মুছিয়া ফেলিলে হয় না ?" আমি জবাব দিলাম, মহাশয়, আমার সমুদয় জীবনের কোনো মূল্য নাই এবং যদি তা মুছিয়া যায় তাহা হইলেও আমার কোনো আক্ষেপ থাকিবে না। কিন্তু যে সামান্য অথচ শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যকে আমি প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছি, যাহাকে দাঁড়-করাইবার জন্য আমি ভবিষ্যতের অগণিত অপরিসীম বিপদকে অতীতের মতোই ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি, আজিকার প্রবন্ধ যাহার অন্তরের কথা, তাহাকে আমি মুছিয়া ফেলিতে পারিব না—কেহই মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। এক বৎসর পর এই বিরুদ্ধবাদীরাই বলিয়াছিলেন, এই কথা স্বীকার করায় দেশের লাভই হইয়াছিল।

১২

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় যাঁহাদের সঙ্গে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, তাঁহাদের প্রত্যেকেই আমেরিকার নামজাদা লোক। আমার তখন আর অপেক্ষা করার সময় ছিল না, অথচ চারিদিকেই তাহাদের জয়-জয়কার শুনিতেছিলাম। নির্ব্বাচনের শেষে জানা গেল, আমিই নির্ব্বাচিত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের তুলনায় আমার ভোটের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখিয়া মনে হইল, আমার উদ্দেশ্যকে দেশের লোক শ্রদ্ধা করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অজ্ঞাত অখ্যাত হইলেও, আমার উদ্দেশ্য অসহায় অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না।

আমি ছিলাম তখন স্প্রিংফিল্ডে। ওকালতি করিতাম। ইতিমধ্যে এত সব ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, তা জানিতাম না। সরকারী গেজেটে নির্ব্বাচনের ফল বাহির হইবার পর রাজনৈতিক প্রথা অনুসারে সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা ভালো ভালো মদ পাঠাইতে লাগিলেন। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, দুঃখিত হইবেন না, আমি কিংবা আমার পরিবারের কেহ কোনোদিন মদ ছোঁয় নাই। হয়ত তাঁহারা যথেষ্ট দুঃখিত হইলেন। কারণ এ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিরা এই নিয়মই পালন করিয়া আসিয়াছেন। আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রমটা ইহাদের নিকট

ভালো লাগিল না, মনে হইল। অতি বিনীতভাবে বলিলাম, ভদ্রমহোদয়গণ, ভগবানের দেওয়া মদই আমার পরিবারের সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আসুন, আমরা উপস্থিত সকলেই, এক এক কাপ উৎকৃষ্ট শীতল জল পান করিয়া আমাদের রাজনৈতিক প্রথা রক্ষা করি। আপনারা হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন, সভাপতি-পদের জন্য আমার নীতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না। বন্ধুরা অগত্যা রাজি হইলেন। তাহারা বুঝিলেন, সভাপতির পদটা অপরের নিকট যতই মূল্যবান হোক, আমি উহাকে ততটা আমল দিতেছি না। আমার প্রতি-বেশীরাও ভাবিয়াছিলেন, মদ্য-পানের বিরুদ্ধে যত বড় বড় কথাই বলিয়া থাকি না কেন, উৎসবের কালে মদের তোড়ে সে সব ভাসিয়া যাইবে। তাহারা বোধ হয় একবারও ভাবিতে চাহেন নাই যে, যে লিঙ্কল্‌ন্ উদ্দেশ্যের জন্যই ইতিপূর্ব্বে প্রিয়তম বন্ধুদের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে, সে নীতির দিক হইতে মদটাও স্পর্শ করিবে না। মানুষ মানুষকে ছোট দেখিবার জন্য যতটা চিন্তা করে, তাহাকে বড় দেখিবার জন্য একবার ভুলেও বোধ হয় ততটা আগ্রহ প্রকাশ করে না। অপরকে বড় অথবা ছোট দেখিবার চিন্তা করিয়া মানুষ নিজের অন্তরের পরিচয়ই দেয়।

জানিতে পারিয়াছিলাম, আমার নির্ব্বাচনের খবর পাইয়া দাস-মহল্লার ভিতর দিয়া ক্ষীণ-ধারায় একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। মনিবের হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের অতিরিক্ত আর কিছু ভাবিবার বিধান তাহাদের জন্য ছিল না। কাজেই

সেদিন এই আনন্দটাকে চোখের মারফতেই নাকি সকলে বিনিময় করিয়া লইয়াছিল। আমি বিভিন্ন স্থানের নিগ্রো-সমাজের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের দুঃখময় অবনত জীবনের যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আমাকে আরো পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষের বাসের জন্য মানুষ এমন ঘৃণ্য ব্যবস্থা করিতে পারে, এবং কতখানি হীন হইলে মানুষে এই ব্যবস্থাটা বরদাস্ত করিতে পারে, এই দুই ভাবনাতেই আমি শিহরিয়া উঠিতাম। নিগ্রো-বৃদ্ধরা ধর্ম্মভয়ে মনিবদের বিরুদ্ধে চলিতে চাহিতেন না। গোলামের পক্ষে গোলামী ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন্ ধর্ম্ম থাকিতে পারে, তাহা আমি জানিও না, বুঝিও না। ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য লড়িবার বিরুদ্ধে যে ধর্ম্ম বাধা দেয়, সে গোলামের গোলামী ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নহে।

একজন রিপাবলিকানের সভাপতির পদলাভে দক্ষিণী নেতারা ঘরোয়া লড়াইয়ের আয়োজন, এবং রাষ্ট্রগুলির বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন সত্য সত্যই সাতটী রাষ্ট্র ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া দলবদ্ধ হইল। নিম্নে, প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে অসহ্য বেদনার দরুণ প্রকৃতির নীরব নিশ্চল ভাব—ঊর্দ্ধে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘ যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত। চারিদিক অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার, বিপদসঙ্কুল। গৃহী গৃহে থাকিয়া মনে করিল, সে একলা জনমানবহীন প্রান্তরে পড়িয়া রহিয়াছে; পথিকে-পথিকে সাক্ষাৎটা অপদেবতার ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছিল। মাঝে মাঝে কামানের

আলোতে, শুধু ডেমোক্রাট-রিপাবলিকান চিনিয়া লইবার সুযোগটুকু ছিল। ভোটযুদ্ধে হারিয়া গিয়া বুলেটের জোরে যুদ্ধ জয় করিবার জন্য দক্ষিণীরা সাজগোজ করিতে লাগিল। বুঝিলাম, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

আমি নির্ব্বাচনে প্রায় বিশ লক্ষ লোকের ভোট পাইয়াছিলাম। এই বিশ লক্ষের ভিতর, যাহারা মানবের পরকালের দুঃখের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য কৃপাপরবশ হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পাদ্রী-পুরোহিত এবং গুরুদের বিশ-জনের ভোটও পাই নাই। ইহারা ধনী ডেমোক্রাটদের পয়সা খাইয়া দেশের জনসাধারণকে এবং নিগ্রো-দাসদিগকে গোলামীর অপূর্ব্ব মহিমাই শুনাইতেছিলেন। কাঁচা পয়সার লোভে ধর্ম্মপ্রচারকগণ সত্য ও ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছিলেন। নানা সময়ে দেখা গিয়াছে, এই সব গুরু-পুরোহিতরা, দুর্ব্বল সত্যের চেয়ে প্রবল অন্যায়কে অত্যন্ত ভয় করেন এবং উহাকে রক্ষা করিতেও চাহেন। যে সময়ে আমি একটা জাতির মুক্তি, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশের প্রকৃত সম্মান বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিলাম, সেই সময় ইহাদের এই বিরোধিতা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, গোলাম-মনিবদের চেয়ে ইহারাই দেশের বড় শত্রু।

আমার হৃদয় তখন বিষম বেদনায় পীড়িত। ধর্ম্মের যাহারা প্রতীক, ধর্ম্মের যাহারা প্রচারক, তাহাদের এই ঘৃণিত ও জঘন্য আচরণে আমার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সকল

প্রচারকরা যাঁহার নাম করিতে করিতে মানবের এতখানি শ্রদ্ধা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, এবং এখন তাহাদেরই কাছে আবার উহা সুদে খাটাইয়া মূলধন বাড়াইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "হে ভগবান, আমি বিশ্বাস করি তুমি আছ। অন্যায় এবং গোলামীকে তুমি ঘৃণা কর, এ বিশ্বাসও আমার আছে। সম্মুখে যে প্রবল ঝড়ের সূচনা দেখিতেছি, উহার পেছনে যে তোমার হাত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার আমার কোনোই কারণ নাই। তুমি তোমার কাজের জন্য যেখানে আমাকে নিয়োগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমি নগণ্য, কিন্তু সত্যই মহান্ সত্যই যা কিছু সব। আমি জানি, আমার আত্মার গর্জ্জন এবং কাতরোক্তি তোমারই ইচ্ছায় হয়। মানুষের যে দুঃখ আমাকে এত ব্যথিত করিয়াছে,তাহা তোমার দান না হইলে এত করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী হইত না। সেইজন্যই,আমি এই বেদনাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছি। এই সত্যই এখন আমার লক্ষ্য, আমার সাধনা, আমার আশ্রয়, আমার যা কিছু সব। এই সত্যকে আমি স্বাধীনতা-নাম দিয়াছি। আমার অন্তর যে অভিসম্পাৎ করিয়াছে, তাহা কখনো ব্যর্থ হইবে না। ডেমোক্রাটরা যে অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া জনমতকে উপেক্ষা করিয়াছে সেই অহমিকাই উহাদের মৃত্যুবান হইয়া রহিল। হে ভগবান, তুমি আমার অন্তরে বাহিরে, সামনে-পেছনে, ডাইনে-বায়ে শক্তি দাও, যেন তোমার পতাকা বহিয়া লইয়া যাইতে পারি। আমার বিশ্বাস আছে,—নিশ্চয়ই

সফল হইব, অবনত দাসজাতির দুঃখনিশির নিশ্চয়ই অবসান হইবে।”

একজন একজনের স্বাধীনতার বিরোধী, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই শাসনতন্ত্রের এবং গোলামীর অবসান যে নিশ্চিত এবং অতি নিকটবর্ত্তী, ইহা ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিলেও বুঝিবার পক্ষে বেশি সহজ হইত না। চোখ্‌ রগড়াইয়া লইয়া সামনের দিকে তাকাইলেই ভবিষ্যৎটা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হইত না। গোলাম-মনিবদের জাত্‌-ভাই গুরু-পুরোহিতদের এই এতটা সাহায্যের ফলেই তাহাদের পাপের ভরা এত তাড়াতাড়ি ডুবিয়া গিয়াছিল। সময় সময় আমার মনে হইত, যে পর্য্যন্ত না এই নিগ্রো-স্বাধীনতাকে গুরু-পুরোহিত এবং পাদ্রীরা ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে মানুষের জন্মগত দাবী মনে করিতেছেন, ততদিন সকলের বুঝিয়া রাখা উচিত, ভগবান স্বয়ং দাসত্বের মূর্ত্তি ধরিয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

আমার মা তখন আমার এক বিবাহিতা ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। ওয়াশিংটনে রওনা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। আমার বিদায়ের কথা শুনিয়া মা আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমার জননীও আমাকে ইহার বেশি স্নেহ করিতে পারিতেন না, অথবা জনষ্টনও আমার মায়ের নিকট ইহার চেয়ে বেশি স্নেহ পাইত না, ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। পঞ্চাশ বৎসর পরে, পরিণত

বয়সেও দেখিতেছি, আমার মায়ের স্নেহ একই ভাবে আমার দিকে বহিয়া আসিতেছে। আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া আমারও চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। তাঁহার নাকি কেবলই মনে হইতেছিল, এই সভাপতির পদলাভের ফলে শত্রুরা আমাকে হত্যা করিবে। যে সভাপতির পদ লাভ করিতে দেখিলে, যে কোনো মা-ই খুসী হয়, সেই পদ লাভ করিয়াও দেখিলাম, আমার মায়ের হৃদয় আমার ভাবনায় ঘনঘটাচ্ছন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি আব্রাহাম লিঙ্কল্‌নের চেয়ে 'আবে লিঙ্কল্‌ন্'ই যে তাঁহার কাছে অনেক বড়, তাহাই বারবার বলিতে লাগিলেন। যদি দাসজাতির মুক্তির ভাবনা আমার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া না বসিত, তাহা হইলে সভাপতির ঐ দুষ্প্রাপ্য আসন, আমার মা-র অশ্রুর পরিবর্ত্তে সেদিন আমি অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিতাম।

আমি মাকে বলিলাম, "তুমি কাঁদিও না। ভগবানের উপর নির্ভর কর, তাহা হইলেই সকল বিঘ্ন-বিপদ দূর হইয়া যাইবে। আমি নিগ্রোজাতির মুক্তির জন্য সমুদয় দেশ জুড়িয়া যে আন্দোলন আনিয়াছি, তাহার ফলেই আজ দেশবাসী তোমার পুত্রকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছে। আজ তোমার চেয়ে আর কাহারো বেশি আনন্দ হইবার কথা নয়। সভাপতির আসন আজ বড় নয়, একটা জাতির মুক্তির কথাটাই সব চেয়ে বড়। সেই সমাজের নির্য্যাতিত নরনারীর এবং শিশুদের দুঃখ

দেখিলে তোমার স্নেহেগড়া হৃদয় যন্ত্রণার উত্তাপে গলিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। যদি তাহারা মুক্তি পায় তাহা হইলে আমেরিকার সম্মান বাড়িবে, খরচের খাতায় লেখা একটা সম্প্রদায় আমেরিকার জমার খাতায়ও একদিন কিছু দিতে পারিবে। এই নিগ্রো-সমাজের মুক্তির জন্য তোমার এবং তোমার পুত্রের প্রয়োজন আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তুমি সেইদিন দেখা না দিলে হয়ত নিগ্রো-সমাজের ভাবনা আমার মাথায় এতটা জঁাকিয়া বসিত না। তোমার আগমনই আমার অন্ধকার অন্তর আলোকিত করিয়া দেশের দুঃখ-দৈন্যের ছবি একে একে আমাকে দেখাইয়া দিয়াছে।

অনেক বলিলাম। যাহা বলিলাম, তাহা বুঝিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে শক্তি নিজেই সেদিন বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছিলেন। আমার ভাবনায় তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। সে অশ্রুর আর বিরাম নাই। সত্যই, তাঁহার এক ফোঁটা অশ্রু, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসনের চেয়ে, আমার নিকট অনেক বড়, আমি অনায়াসে ইহা ত্যাগ করিতে পারি। নারীর হৃদয় যে কত মহান্, কত পবিত্র, কত উচ্চ তাহা আমি ভাবিতেই পারি না। জোর করিয়া না বলিলে, তাঁহাকে বিমাতা বলার আর উপায় ছিল না। এই রকম চরিত্রকে বিমাতা বলা আর মাতৃত্বের উপর অভিযোগ করা একই কথা।

অনেক কষ্টে মা-র বাহুপাশ হইতে নিজের দেহটাকে

মুক্ত করিলাম। যাহারা আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার জন্য এত কাণ্ডকারখানা করিয়াছে, আজ আবার তাহারাই আমার মাথার উপর বিপদ কল্পনা করিয়া ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা যেন দিব্যচক্ষে আততায়ীকে দেখিতে পাইতেছিল। ইহাদের স্নেহ-ভালোবাসা-বিশ্বাস দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি।

১৮৬১ সালের জানুয়ারা মাসে সস্ত্রীক ওয়াশিংটনে রওনা হইলাম। যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে বিদায় সম্ভাষণ দিতে যাইয়া আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "বন্ধুগণ, এই বিদায়ের কালে আমার ভিতরে যে কি বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবে না। তোমাদের ভালোবাসার ফলেই আজ আমি এত বড় হইয়াছি। তোমরা যাহা চাহিয়াছ, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহাকে রূপ দিবার নিমিত্ত যে মানুষটী গড়িয়াছ, তাহাই তোমাদের আব্রাহাম্‌ লিঙ্কল্‌ন্‌। রাষ্ট্রসভায় আমি তোমাদের প্রতিনিধি। তোমাদের প্রাণের ভাষাকে মূর্ত্তি গড়িবার জন্যই আমি সেখানে যাইতেছি। কর্ম্মক্ষেত্রে আমি তোমাদের ভৃত্য, তোমাদের যাহাতে তৃপ্তি, তাহা করাই আমার কাজ। যদি আমার উপর কর্ম্ম করিবার সকল অধিকার তোমরা দিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ ঘটিবে না, তোমাদের গৃহস্থালাতে কোনো গণ্ডগোল বাধিবে না। জগতের অন্যান্য জাতির প্রতিনিধিরা—যাহারা অতিথি ভাবে এখানে অবস্থান

করিতেছেন, আমি তাঁহাদের আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটী ঘটিতে দিব না। আমি তোমাদের উন্নতশির চিরদিনের মতো উন্নত রাখিবার জন্য সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিব। আবার কবে তোমাদের ভিতরে আসিয়া মিলিত হইব জানি না, তবে আশা করি তোমাদের হুকুম তামিল হইলেই ফিরিতে পারিব। আমার কর্ত্তব্য দিনের পর দিন যেন ক্রমেই বড় হইয়া পড়িতেছে। আমার পরম ভক্তিভাজন জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পর, এপর্য্যন্ত আর কোনো সভাপতির উপর এত গুরু ভার পড়ে নাই। তোমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, যেন আমি এই গুরুভার সহজে নামাইয়া দিতে পারি। আমার চেয়ে তোমাদের দায়িত্বই বেশি, কারণ তোমাদের কাজের জন্য তোমরাই আমাকে বহাল করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ওয়াশিংটনের ডাকে রক্তদান করিয়া আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের কিছু কম শতবর্ষ পরে আমি আবার তোমাদিগকে ডাকিতেছি। এবারেও তোমাদিগকে রক্তদান করিয়া ওয়াশিংটনের অসমাপ্ত কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে হইবে। গত যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল ইংরেজের সঙ্গে, স্বাধীনতা-লাভের জন্য, এবারে যুদ্ধ বাঁধিবে ঘরে ঘরে, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার জন্য। তোমরা আমেরিকার সম্মান বাড়াইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হও, ভগবানের নিকট আমাদের জয়লাভ প্রার্থনা কর।”

১৩

ওয়াশিংটনে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তার আধখানায় আলো, আর আধখানায় অন্ধকার। রিপাবলিকান্ এবং ডেমোক্রাট গোপনে গোপনে যার যার সুবিধামতো ছুরি শানাইতেছে। সেখানে যে কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে ভয় এবং ভরসা দুই ই ছিল।

ভয় মানুষের বাহিরে নয়, ভিতরে। আমি যৌবনে, যে সাধনা মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম, তাহার সিদ্ধিলাভ না-হওয়া পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু ঘটিতে পারে না, এই বিশ্বাস আমার ছিল। জগতের এক ভয়ানক ব্যভিচার মুক্তির জন্য দিবানিশি কাঁদিতেছিল। আমি বহুদিন বহুবার এই কান্না শুনিয়া শুনিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কাজেই, আমার ভয় পাইবার কোনো কারণ ছিল না। আমি ডেমোক্রাটদের ভয় উপেক্ষা করিয়া কোনো বিশেষ রাষ্ট্রিয় উৎসবের দিনে দেশের শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "এই আসন্ন ঘরোয়া-লড়াই বাধানো তোমাদের হাতে, আমার হাতে নয়। তোমরা স্থির জানিও, গবরমেণ্ট কখনো গায়ে পড়িয়া তোমাদের সহিত ঝগড়া বাধাইবেনা। দেশের এই শাসনতন্ত্রকে উড়াইয়া দিবার জন্য নিশ্চয়ই তোমরা

ঈশ্বরের কাছে কোনো শপথ কর নাই, কিন্তু এই গবর-মেণ্টের মঙ্গলবিধানের জন্য, তাহাকে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী। আমরা এখনো পরস্পারের বন্ধু। যে বলে আমরা পরস্পারের শত্রু সে মিথ্যাবাদী সে দেশের শত্রু। আমরা দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে, আমাদের ভিতরে কোনো দলাদলির ভাব আসিতে পারিবে না। কখনো কখনো প্রবৃত্তি আমাদিগকে বিরোধের জন্য উস্কাইতে পারে সত্য, কিন্তু দেশের মঙ্গল লক্ষ্য হইলে আমাদের স্নেহ ভালোবাসার পবিত্র বন্ধন কখনো ছিন্ন হইবে না। বিদেশীর হাত হইতে তোমরা দেশকে স্বাধীন করিয়াছিলে কি, আজিকার এই ঘরোয়া লড়াইয়ের জন্য ? শিক্ষিত এবং সভ্য মনোবৃত্তির লক্ষণ কি ইহাই ? নির্য্যাতিতের আর্ত্তনাদ কি তোমাদের নিকট এতই তৃপ্তিকর ? আজ আমার অসন্তুষ্ট দেশবাসীর নিকট ইহাই আমার একমাত্র জানিবার বিষয়।”

সভাপতির আসনে বসিয়াই বুঝিতে পারিলাম, ডেমোক্রাট-দের যখন আধিপত্যের যুগ ছিল, তখন হইতেই ইহারা ঘরোয়া লড়াইয়ের ফিকিরে ছিল। উত্তরাঞ্চলের সকল শক্তি খর্ব্ব করার এবং নিজেদের সকল শক্তি বৃদ্ধি করার যত রকম উপায় ইহাদের হাতে ছিল, তাহার সবগুলিই ইহারা কাজে লাগাইয়াছিল। খাজাঞ্চিখানার কর্ত্তা হাওয়েল কব, জর্জ্জিয়া প্রদেশের গোলামের মালিক ছিলেন। তাহার

স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য, সরকারী ধনাগারের পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত তিনি নিজেদের এলাকায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। গবরমেণ্টের এই দেউলিয়া অবস্থায় টাকা ধার-পাওয়া অসম্ভব না হইলেও, বিষম ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কার্য্যকালেই তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা—উত্তরাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ রক্তবিন্দু—দক্ষিণাঞ্চলে সৈন্যদল গড়িয়া এবং দুর্গ তৈরী করিয়া সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। জন্‌ ফ্লয়েড্‌ ছিলেন সমর-বিভাগের কর্ত্তা। ভার্জিনিয়া প্রদেশে ইহারও এক বড় রকমের গোলামের আবাদ ছিল। হাওয়েল কবের মতো তিনিও উত্তরাঞ্চলের অস্ত্রাগার হইতে কামান-বন্দুক-গুলী-গোলা হইতে যুদ্ধের উপযোগী সামান্য জিনিষটা পর্য্যন্ত ঝাঁটাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পাছে সুঁচ্‌টিও উত্তর অঞ্চলের কোনো কাজে লাগে, এই ভাবনাও তাহার কম ছিল না। নৌ-বহরের কর্ত্তা আইজাক্‌ তৌসী গোলামখানার মালিক না হইলেও, বিদ্রোহী নেতাদের "মাসতুতো ভাই" বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। তৌসী ৯০ খানার ভিতর ৮৮ খানা সরকারী জাহাজ চারিদিকে দূর-দূরান্তে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্রোহ সুরু হইলে সেগুলি যাহাতে কাজে না লাগানো যায়, ইহাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই রকম যখন দেশের অবস্থা, রিপাবলিকানরা যখন পথের ফকির, এবং ডেমোক্রাটরা দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা, ঠিক সেই সময়ে আমাকে বাধ্য হইয়া রাষ্ট্রের বিরাট বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে হইল।

সহায়-সম্পদ-ভরসা আমার কিছুই ছিল না, তথাপি আমাকে ভয় দেখাইবার মতো অবস্থা ডেমোক্রাটরা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। জীবনে আমি নানা রকম অবস্থা পার হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনের রাজপ্রাসাদে যে শক্তির বলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এক ঐশ্বরিক শক্তি ভিন্ন তাহাকে দাবাইয়া দিতে পারে, আজ পর্য্যন্ত তেমন শক্তির সন্ধান আমি পাই নাই। কর্ম্ম যদি কর্ম্মীর সাধনার বস্তু হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধ শক্তি যত প্রবলই হউক না কেন, তাহার ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই। ৪০ লক্ষ নিগ্রোর আশিষ এবং কাতর আহ্বান যেভাবে আমাকে শক্তি ও উৎসাহ দিতেছিল, তাহার তুলনা জগতে সকল সময়ে পাওয়া যায় না। নিগ্রোজাতির মুক্তির জন্য মুষ্টিমেয় রিপাব্লিকান্ যে জয়ধ্বনি করিতেছিল, বিদ্রোহীদের দুর্গ ভাঙ্গিবার পক্ষে তাহার আঘাতই সেদিন যথেষ্ট মনে করিয়াছিলাম।

এই সময়ে জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং চরিত্রে, রাষ্ট্র-দরবার উজ্জ্বল করিয়া সকলের উর্দ্ধে মাথা তুলিবার জন্য, একটী যুবক ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। পশ্চিম আমেরিকার জঙ্গলি মুলুক পার হইয়া, নিজের জীবনটাকে সকল দিক হইতে নিজের চেষ্টায় সার্থক করিয়া, সে কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছিল। দেশের প্রতি অকপট ভালোবাসাই এত অল্প বয়সে তাহাকে জনসাধারণের বিশ্বাস-ভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। সে যে নিজের জীবনটাকে নিজের

জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে চাহে নাই, ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। সে রাশি রাশি বই পড়িয়াছিল এবং সেগুলিকে ঠিক ঠিক মতো হজমও করিয়াছিল। আমি লোকচরিত্র পাঠ করিয়া করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহার দ্বারা বুঝিয়াছি, তাহার তুল্য সকল রকমে গুণী সদস্য রাষ্ট্রদরবারে আর নাই। পরিণত বয়সে সে সভাপতি হইবেই, এবং সেদিন আমেরিকা একজন প্রকৃত মানবপ্রেমিক নায়ক পাইয়া গৌরবান্বিত হইবে। আমি ওয়াশিংটনে বসিয়া যে বিরাট যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছিলাম, সে ওহায়োর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া তাহার জন্য রাশি রাশি সমিধ্ সংগ্রহ করিতেছিল। পরাক্রান্ত ডেমোক্রাটদের পক্ষপাতী কোনো ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত পিতা-মাতার সন্তান, এবং নিজে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও, লক্ষ লক্ষ নিগ্রোর মুক্তির জন্য ধর্ম্ম এবং সমাজ পরিত্যাগ করিয়া, মুষ্টিমেয় রিপাবলিকানকে আলিঙ্গন দিতে অপেক্ষা করে নাই। আমি তাহার মতো এমন নিষ্কাম কর্ম্মী আর কয়জন দেখিয়াছি, মনে পড়ে না।

ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটিল। বিদ্রোহীদের এক প্রধান আড্ডা সাম্‌টার দুর্গের পতনের পর, ভোটযুদ্ধে আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রাট-দলের অন্যতম প্রধান নেতা ডগ্‌লাস্, আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শুধু তাহাই নহে, একজন রিপাবলিকান্ আর একজন রিপাবলিকান্‌কে যতটা ভালোবাসিয়া থাকে, একজন প্রকৃত রাজভক্ত যেভাবে

রাজাকে অভিনন্দিত করে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, ডগ্‌লাস্‌ও তাঁহাদের সভাপতির সঙ্গে ঠিক সেই রকম ব্যবহারই করিয়াছিলেন। সেদিন আমার মনে হইয়াছিল, সাম্‌টার দুর্গের পতন ১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল হয় নাই, ইহা প্রকৃত পক্ষে হইয়াছিল, সেইদিন—১৪ই এপ্রিল। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, তাঁহার এই স্বদেশপ্রেম যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক নব যুগ আনিয়া দিবে। দেশরক্ষার জন্য আমি নূতন ঘোষণা-পত্রে ৭৫ হাজার লোক চাহিয়াছিলাম, তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আপনি দুই লক্ষ লোকের জন্য আবেদন করুন। ঐ সকল হীনপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত ডেমোক্রাটদের মতলব আমার যতটা জানা আছে আপনার ততটা জানা নাই। তৎক্ষণাৎ একটা মানচিত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন, "এই সকল স্থান অতি সঙ্গীন্, এইগুলি অবিলম্বে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করুন। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য গবরমেণ্টের খুব শক্ত হওয়া দরকার এবং যুদ্ধ চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত।" আমি পরে জানিয়াছিলাম, আমাদের এই মিলনের মূলে ছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌সের মিঃ আশ্‌মুন্। মিঃ আশ্‌মুনের এই কর্ম্ম ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এই ঘটনার পরদিন মিঃ ডগ্‌লাস্ নিজেই সংবাদপত্রের মারফত আমাদের মিলনের কথা প্রকাশ করিলেন। আমাদের এই বন্ধুত্ব আজিও অটুট রহিয়াছে।

সাম্‌টারের পতনের পর বিদ্রোহী মহলে একটা সাড়া পড়িয়া

গেল। অতঃপর রিপাব্‌লিক্‌ গবরমেণ্টের সম্মান এবং শক্তি-বৃদ্ধির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার আর কোনোই অভাব রহিল না। কোনো কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে, তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকা অবশ্য দরকার। কিন্তু আমার সামরিক অভিজ্ঞতা মোটেই ছিল না। আমার ত্রুটী সংশোধন করিবার জন্য গুণী লোকদের পরামর্শ লইতাম, এবং কেহ কোনো বিষয়ে পরামর্শ দিতে চাহিলে আমি তাহা মনো-যোগের সহিত শুনিতাম। এইভাবে, আমার সমর-বিজ্ঞানের চিন্তার ভিতর যে সকল খুঁৎ ছিল, আলাপ-আলোচনার ফলে তাহা দূর করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এই উপায়ে, শুধু আমি নিজেই যে লাভবান হইয়াছিলাম, তাহা নহে। যাহারা আলাপ করিত, তাহাদের কাহার কতটা বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড়, তাহাও ঐ সময়ে মাপিয়া রাখিতাম। এই মাপ-জোখের উপর তাহাদের ব্যক্তিগত মঙ্গল, এবং দেশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিত। শাসন-বিভাগের কাজেও আমি পুরাতন লোকদের নিকট অনেক কিছুই শিখিয়াছি। কোনো লোককেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকেই একটা-না-একটা জবাব দিবেই। যদি তাহা নিরর্থক হয় তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। এই উপায়েই, বহু লোককে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলাম। কোনো জটিল প্রশ্নের উত্তর সকলেই দিতে পারে না সত্য, কিন্তু অন্ততঃ একজনের নিকটও উহার উত্তর আশা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঊর্দ্ধতন কর্ম্মীর, তাহার নিম্নতন কর্ম্মীকে

ভাবিবার এবং আলাপ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। কোনো লোক শ্রেষ্ঠ থাকে না, শ্রেষ্ঠ হয়। আমি, মানুষকে কল-কব্জা মনে করা আর তাহার উপর অত্যাচার করা, একই ব্যাপার মনে করি। কি উপায়ে তাহার দেহের পেশী ও মস্তিষ্কের স্নায়ু পুষ্ট হইবে, কি উপায়ে বিশুদ্ধ রক্ত-প্রবাহ তাহার ভিতরে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ইহাই আমার লক্ষ্য। সকল রকমে অবনত মানবজীবনকে সার্থক করিয়া তোলাই আমার একমাত্র সাধনা।

এই যুদ্ধ চালাইবার সময় আমি নিজে সৈন্য-চালনা করিয়াছি। এ বিষয়ে পণ্ডিত লোকদের মতামত শুনিয়া আমার চিন্তার উন্নতি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। অন্যান্য বিভাগের কাজও আমি নিজে দেখিয়া থাকি। বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষরা প্রাণ দিয়া কাজ করেন, কাজটাকে নিখুঁৎ করিবার জন্য চেষ্টাও করেন, তথাপি আমি তাহা সব সময় মানিয়া লইতে পারি না। বৈদেশিক রাজদূতদের সহিত আলোচনার মুসাবিদাও অনেক সময় নিজ হাতেই লিখিয়া থাকি। ছোট বেলা হইতে নিজ হাতে সব কাজ করিয়া আসিয়াছি বলিয়াই, বোধ হয়, আমার প্রকৃতি এই রকম হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে এক ভীষণ পরীক্ষা আমার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। একদিকে চলিতেছিল, ডেমোক্রাটদের সঙ্গে রিপাবলিকানদের যুদ্ধ, আর একদিকে যমের সঙ্গে আমাদের পরিবারের লড়াই। দেশ বড়, কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বড় ; অসংখ্য নিগ্রোর

মুক্তির সাধনা বড়, কি পুত্র-স্নেহ বড়—মাত্র একটী কথার উপর আমার পরীক্ষায় পাশ-ফেল নির্ভর করিতেছিল। আমার চারিটী পুত্রের ভিতর একটী ওয়াশিংটনে আসিবার পূর্ব্বে মারা যায়, একটীর উপর মৃত্যুর পরোয়ানা তখন জারী হইয়া গিয়াছিল, আর একটী ওয়াশিংটনে আসিবার পর মারা যায়। কাজেই, পুত্র-স্নেহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। কিন্তু গোলাম-খানার কুঠুরীর ভিতর কত মাতা যে নিজ সন্তান হারাইয়া এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারে না, কত পিতা যে মনিবের হুকুম তামিল করিবার পূর্ব্বে পীড়িত সন্তানের মুখের দিকে তাকাইবার জন্য এক মুহূর্ত্ত সময় করিতে পারে না, এই সব কথা মনে পড়িতেই আমি পুত্র-স্নেহ ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। আমি যেন তখন ওয়াশিংটনের 'প্রাসাদ ছাড়িয়া গোলাম-মহল্লায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

১৪

মহৎ কাজের তুলনায় আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল্য খুবই কম। কিন্তু হাজার হাজার লোকের মৃত্যু-তালিকা দেখিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, যাহারা অকাতরে, বিনা বাক্যব্যয়ে, উদ্দেশ্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া তাহারই জন্য প্রাণ দেয়, তাহারা পবিত্রচেতা এবং তাহাদের জীবনের দাম অনেক বেশি। তাহাদের অমূল্য জীবন এক একটা জয়স্তম্ভের মতো। তাহারা কণ্টকময় স্থানের উপর নিজেরা পড়িয়া থাকিয়া, ধূলি ধূসরিত পথ নিজরক্তে ভিজাইয়া দিয়া, আমাদের জয়-পতাকা লইয়া যাইবার জন্য পথ করিয়া দেয়। এই বিরাট যুদ্ধের চাপ আমাদের সকলের উপরেই পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু, সকলের চেয়ে বেশি পড়িয়াছিল, সৈনিকদের উপর। নিজের জীবনরক্ষার জন্য অনেকেই অনেক কিছু করিতে পারে, কিন্তু সৈনিক দেশের গৌরবের জন্য, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য, অকাতরে নিজেকে বলি দিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের এই অকপট ত্যাগের কথা যখন ভাবি, তখন ইহাদিগকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারি না। সৈনিক শুধু আমাদের যুদ্ধের একটা বড় রকমের খোরাক মাত্র নহে—আমি তাহাদিগকে আমাদের মূর্ত্তিমন্ত বল-ভরসা-গৌরব এবং শৌর্য্য-বীর্য্য মনে করি। সৈনিক-

দিগকে বলি দিয়া জাতি কতখানি লাভ করে তাহা সে জানেনা, জানিবার দরকারও হয়ত মনে করে না। আমার একটী পুত্র এবং একটী সৈনিক আমার সমান স্নেহের পাত্র। আমি তাহা-দিগকে আমার স্নেহ নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি ইহা যেদিন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেইদিনই বোধ হয় তাহারা প্রথম আমাকে পিতৃ-সম্বোধন করে। ইতিপূর্ব্বে যাহারা সৈনিকগণের এই প্রকার শ্রদ্ধা-ভালোবাসা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার শ্রদ্ধা জানাইতেছি, ভবিষ্যতে যাহারা এইরূপে গৌরবান্বিত হইবেন তাঁহাদের জন্যও আমার শ্রদ্ধা জমা রহিল। আমার এই সকল বীর-পুত্রেরা, নিগ্রোজাতির মুক্তি আনিয়া দিয়া, তাহাদের পিতার সত্য-রক্ষায় সাহায্য করিয়াছে।

আমার শারীরিক এবং মানসিক অত্যন্ত খাটুনির ফল ভালো হইবে না মনে করিয়া, জনকতক বিশিষ্ট লোক সৈনিকদের সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে রাজি হই নাই। সৈনিক-হিসাবে তাহারা আমাদের জন্যই মরিতে গিয়াছে, অথচ তাহাদের এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধবের,—পিতা-মাতা ভাই-বোনদের—এক-আধটা কথায়, রাজপ্রাসাদে বসিয়া আরামে থাকিয়াও আমরা কান দিতে পারিব না, ইহা আমার নিকট আদৌ ভালো লাগে নাই। বিশেষতঃ তাহারা আমার সন্তান। তাহাদের আবেদন-নিবেদনে যে দুঃখ-বেদনা লেখা থাকে তাহা অপরে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি দিয়া সকল সময় সকল বস্তু মাপা যায় না। এইজন্যই আমি

নিজে সৈনিকগণের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি। হয়ত ইহারা আমার এই সরল সহজ উত্তরে খুসী হইতে পারেন নাই। না-হইবারই কথা,—ইহারা বুঝিতেন, সভাপতির পদ, রাজপ্রাসাদ, সাধারণের জন্য অনাবশ্যক গম্ভীরভাব এবং নির্ব্বিবাদ জীবন। এই সব ভাব বজায় রাখিয়াই ইহারা দরিদ্রের নিকট বিধাতার মানসপুত্র বিবেচিত হইতেন।

সৈনিক-বিভাগ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া চলি বলিয়া,অনেক সেনাপতিই আমাকে দোষ দিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, যে সব কারণে তাঁহারা আমার উপর বিরক্ত, সেগুলি তাঁহাদের বিচারে গুরুতর সন্দেহ নাই। কারণ এ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসনে এরূপ অদ্ভুত লোক আর তাঁহারা কখনো দেখেন নাই। যে সংস্কারের কাঁধে পিঠে চড়িয়া তাঁহারা পুরুষানুক্রমে মানুষ হইয়া থাকেন, তাহার শিক্ষা ভুলিয়া যাওয়া এক পুরুষে সম্ভব নয়। অপরকে শাস্তি দিতে হইবে বলিয়া চব্বিশ ঘণ্টা খড়্গহস্ত হইয়া থাকা আমি পছন্দ করি না। সামরিক নিয়মানুসারে হয়ত অনেকের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল, এবং সেইটাই তাঁহারা চাহিতেছিলেন। কিন্তু যে সব অবস্থার ভিতর দিয়া সৈনিকরা দুঃখে কষ্টে জীবনটাকে টানিয়া লইয়া চলে, ফাঁসির পূর্ব্বে একবার তাঁহাদের অপরাধটা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। আমি বহু বহু ফাঁসির হুকুম রদ করিয়াছি। এক আসামীকে মৃত্যুদণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য দুপুর রাত্রি হইতে পরদিন ফাঁসির পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চার ভিন্ন

ভিন্ন লাইনে 'তার' পাঠাইয়াছিলাম। আমাকে যাহারা অকপট ভক্তি করে, আমার উপর যাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহাদের উপর কথায় কথায় ফাঁসির হুকুম আর আত্মহত্যা আমি একই বিধান মনে করি। ইতিপূর্ব্বে শত শত সেনাপতি ফাঁসি দিয়া যে পুরাতন নিয়মের শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াছেন, তাহার চেয়ে শৃঙ্খলা-রক্ষার উৎকৃষ্টতর নূতন পন্থা যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান সভাপতিই আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমি অবস্থা অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিয়া নিজহাতে পুরস্কৃত করিয়াছি। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাকে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিদায়ও দিয়াছি। আমি প্রাণ লইয়া বিভীষিকা দ্বারা শান্তি-প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষিত ও সভ্য মনোবৃত্তির কার্য্য মনে করি নাই। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি যে মূর্ত্তিমান যম নহেন, পরন্তু তাহাদেরই নিতান্ত আপনার জন, আমি এ ধারণা আমেরিকার সেবা করিতে যাইয়া সর্ব্বত্র বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্বাসঘাতক এবং দেশদ্রোহী কখনো আমার নিকট ক্ষমা পায় নাই, আবার ডেমোক্রাটদলের সৈনিকদের অকপট ব্যবহারও আমি উপেক্ষা করি নাই। আমি মানুষকে মানুষই মনে করি। তাহাকে মানুষ গড়িয়া তোলা এবং মনুষ্যত্বের সম্মান দেওয়া আমার ধর্ম্ম।

নিগ্রো-জাতির মুক্তির জন্য রণদেবতার অভিনয় করার বাসনা আমার কোনোদিনই ছিল না। ডেমোক্রাটদের মনুষ্যত্বের

অভাবই এই যুদ্ধের কারণ। ইহার জন্য ডেমোক্রাট নেতারাই দায়ী। যুদ্ধের পর যুদ্ধে অনর্থক লোকক্ষয় হইতেছিল। পদে পদে লোকক্ষয় করিয়া অবিরাম জয়েও আমার আনন্দ হয় না। কয়েকটী ধারাবাহিক যুদ্ধে রিপাব্‌লিকান্‌গণ হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। দিনের পর দিন তাহাদের ভাবনায় আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। সে শোক আজিও ভুলিতে পারি নাই। এক যুদ্ধে আমি আমার বিশ হাজার সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। সে বেদনার চাপ আজিও বোধ করি।

দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘণ্টায়, দীর্ঘকাল ধরিয়া কেবলি লোকক্ষয় আর রিপাবলিকানদের পরাজয়ের কাহিনী শুনিয়া আসিতেছিলাম। "জয়" শব্দটী যে সময় তাহারা ভুলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় শিকামৌগার যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ পাইলাম। বহুকাল পর আমি প্রাণ খুলিয়া সেই বোধ হয় প্রথম হাসিয়াছিলাম। শিকামৌগায় আমার পুত্রদের জয়-লাভের ফলে মৃতবীরদের আত্মা ফিরিয়া আসে নাই সত্য, কিন্তু যে জন্য তাহারা মরিয়াছিল তাহা কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই জয়লাভে সকল পরাজয়ের ক্ষতি সুদে আসলে পূরণ করিয়া দিয়া লাভের অঙ্কও কিছু দেখা গিয়াছিল।

শিকামৌগার যুদ্ধজয় সেনাপতি গার্‌ফিল্ডের অদ্ভুত কীর্ত্তি। বড় বড় রণপণ্ডিতগণ যে রণ-কৌশল দেখাইয়া থাকেন, এই যুদ্ধের কৌশলও ঠিক সেই শ্রেণীর। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, একমাত্র গার্‌ফিল্ডের জন্যই এই যুদ্ধজয় হইয়াছিল।

সে না-থাকিলে রিপাব্‌লিকানদের পরাজয়ের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়িয়া যাইত, যার ফলে তাহারা বাধ্য হইয়া দেউলিয়া হইয়া পড়িত। তাহার অন্তর খুব উঁচু। লোকের অল্প বেদনাও তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া জোরে ঘা দেয়। এই দরদের জন্যই, যেভাবে সে তাহার ক্ষুধার্ত্ত এবং রণশ্রান্ত সৈনিকদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহা একমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব। আমি অবিলম্বে তাহাকে মেজর-জেনারলের পদে উন্নীত করিয়াছিলাম।

কয়েক মাস পরে ওহায়োর নরনারী যখন তাহাকে কংগ্রেসের সদস্য মনোনীত করে তখনো সে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু দেশের স্বার্থের কথা উল্লেখ করিয়া যখন আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তখন আর তাহার কোনো আপত্তি রহিল না। দেশহিতই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

যে সকল পিতামাতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে, এবং ভগিনী ভাইকে, দেশের জন্য মানবের মুক্তির জন্য, অকাতরে মৃত্যুর মুখে সঁপিয়া দিয়াছেন আমি তাঁহাদের উন্নত চরিত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া পড়ি। ইহাদের অনেকেই যথেষ্ট শিক্ষিত নয়, অথচ ইহাদের কার্য্যাবলী উচ্চ-শিক্ষিতের মতো। ইহারা যেন জীবন আর মৃত্যুকে বেশ পরখ করিয়া দেখিয়াছিলেন। মৃত্যুর ভিতরেও যে একটা আনন্দ আছে, তাহার সন্ধান ইহারা পাইলেন কেমন করিয়া, তাহা আমি আজিও ভাবিয়া পাই নাই। আমার ইচ্ছা করিত এবং এখনো ইচ্ছা করে, সেই সকল

মাতা-স্ত্রী এবং ভগিনীগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের আনন্দের সঙ্গে আমার অনুভূতিটাও মিশাইয়া দিই। আপনারা হয়ত আমার ভাবুকতাটাই বড় করিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু না-দেখিয়াও উপায় নাই। এক রমণী তাহার পাঁচ-পাঁচটী পুত্রকে একে-একে হারাইয়াও আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। আমি সমর-বিভাগের মারফত তাঁহার পাঁচ-পাঁচটী পুত্রের মৃত্যুর খবর পাইয়া নিজ হাতে তাঁহাকে চিঠি দিলাম। যে একে-একে পাঁচটী সন্তানকে দেশের জন্য উৎসর্গ করিতে পারিয়াছে, সে নিশ্চয়ই অপরের প্রশংসা বা সান্ত্বনার অপেক্ষা রাখে নাই। তথাপি আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছিলাম। এই রকম বহু বহু ঘটনা রহিয়াছে।

আমি আমার রুগ্ন এবং আহত সৈনিক-পুত্রদের সাহায্যের জন্য নানা রকম প্রতিষ্ঠানের মারফত সাহায্য চাহিয়াছিলাম। দেশবাসী তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। সে দানের ভিতর নগদ টাকা ছিল ১৫৬২৫০০০। ইহা ছাড়া হাজার হাজার জামা, কাপড়ের থান, কম্বল, সোয়েটার, জুতা এবং মোজা ইত্যাদি তো ছিলই। ছোট ছোট দানের পরিমাণই ছিল বেশি। এইরূপ ছোট দানের বিচার করিয়াই জাতির প্রাণের কথা সহজে বুঝা যায়। এইরূপ অসম্ভব এবং অসংখ্য দান পাইয়া আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি তখন সরিয়া পড়িলেও জনসাধারণ নিজেরাই যুদ্ধ চালাইতে পারিত। ইহাদের জড় চিন্তা-জগতের

আড়ালে থাকিয়া যে চৈতন্য তখন ক্রিয়া করিতেছিল, তাহাকে দাবাইয়া দিবার মতো ক্ষমতা কাহারো ছিল না।

এই যুদ্ধে আমেরিকার নারীদের কার্য্য প্রশংসার অতীত হইয়াছিল। আমি স্তোকবাক্যে অভ্যস্ত নই। কি রকম প্রশংসা করিয়া নারীদিগকে খুসী করিতে হয়, তাহাও আমার জানা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সৃষ্টির সময় হইতে কবি এবং বক্তারা নারীর কার্য্যের যত রকমের প্রশংসা করিয়াছেন, আমেরিকান্ রমণী তাহার সকল গুলিরই যোগ্য। এই যুদ্ধকালে কবি এবং বক্তারা অপ্রয়োজনে নারীর প্রশংসা করিলে, নারীকে ছোট করিয়াই ফেলিতেন। নারী আপনার মহিমায় আপনিই ফুটিয়া উঠিয়াছেন। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমেরিকান রমণীর অন্তরে শক্তি ও শান্তি দান করেন।

আমি কোনোদিন কাহারো প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করি নাই। আঘাত করার পরিবর্ত্তে আহত হওয়াও বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছি। যতদূর মনে পড়ে, বলিতে পারি, কাহারো প্রতি রূঢ় ভাষাও কখনো ব্যবহার করি নাই। সেই অভ্যাসেই আমি দক্ষিণী-সৈন্যদের সুযোগ সুবিধাও দেখিয়াছিলাম। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গে বন্দী, আমার পুত্রেরা চরম ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিল। তাহাতে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমি আশা করি নাই, ঐ অঞ্চলের নেতারা আমাকে ধরিবার সুযোগ না পাইয়া, তাহাদের প্রতি বর্ব্বরতা

প্রকাশ করিয়া এতটা গৌরব বোধ করিবে। দক্ষিণের নেতারা মানুষের উপর নীচ ব্যবহার করিতে করিতে নিজেদের গুণগুলি হারাইয়া ফেলিয়া একেবারে আস্ত-জানোয়ার বনিয়া গিয়াছিল। নেতৃত্বের গুণ উহাদের একতিল ছিলনা, অথচ তাহাদেরই পরিচালিত বহু বহু দক্ষিণী-সৈন্যের করমর্দ্দন করিয়া আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ সুদিনের আভাষ দিতেই তাহারা বর্ত্তমানের আরামের কথা ভুলিয়া যখন কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফেলিল, তখন বুঝিলাম, সভাপতির আসনের মর্য্যাদা আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছি। আমার সেনানীদের ব্যবহারে আমি যারপরনাই খুসী হইয়াছিলাম। তাহারা যে সত্যই একটা জাতির মুক্তিকামী ইহা তাহাদের ব্যবহারেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৫

যাহারা একে-একে দুই, দু'য়ে-দু'য়ে চার হিসাব করিয়া চলেন, তাহাদের জন্যই আমার নিগ্রো-মুক্তির ভাবুকতাকে যুক্তিমূলক রাজনীতির উপর দাঁড়ো করাইয়াছিলাম।

আমি শুধু নিগ্রো জাতিকে গোলামী হইতে মুক্তি দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চাহি নাহি। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণের উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক ছিল। মানুষ আমি, নিগ্রোকে মুক্তি দিয়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি ; শ্বেতাঙ্গ আমি, নিগ্রোকে মুক্তি দিয়া নিগ্রোর প্রতি শ্বেতাঙ্গের অকথ্য দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি ; দরিদ্র আমি, নিগ্রোকে মুক্তি দিয়া দরিদ্রের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছি ; স্বাধীন আমি, পরাধীনকে মুক্তি দিয়া স্বাধীনতার অফুরন্ত অনন্ত মহিমা প্রচার করিয়াছি।

ভোগাসক্ত শ্বেতাঙ্গজাতি কোন্ অন্ধকার গহ্বরে চিরদিনের জন্য অধঃপাতে যাইতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। গোলামী করিয়া করিয়া নিগ্রো-সমাজ চরিত্রহীন হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের চরিত্রহীনতা আরো ভয়ঙ্কর হইত। ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত শ্বেতাঙ্গজাতি, সর্ব্বপ্রকারে দুর্ব্বল মানুষকে গোলামীতে বাহাল করিয়া নিজেদের যে আভিজাত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, আমি নিজ হাতে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। আমি নানা ক্ষেত্রে নানা

উপায়ে দেখিয়াছি,নিগ্রোরা গোলাম হইলেও অমানুষ হয় নাই। ইহাদের ভিতরেও দয়া-মায়া-ভালোবাসা পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ইহারা গোলাম সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল গুণের উপর গোলামীর একবিন্দু কালো দাগও পড়ে নাই। বহু বহু স্বাধীন শ্বেতাঙ্গের মনুষ্যত্বে ও লক্ষ লক্ষ গোলাম কৃষ্ণাঙ্গের মনুষ্যত্বে আমি কোনো প্রভেদ খুঁজিয়া পাই নাই। শ্বেতাঙ্গের নিজ হাতে গড়া আভিজাত্য শ্বেতাঙ্গের হাটে যে দরে বিক্রয় হইয়াছিল, কোনো নিরপেক্ষ দোকানদারের হাতে পড়িলে, কৃষ্ণাঙ্গের মনুষ্যত্বের তুলনায় উহা বেশি দামে বিক্রয় হইত না।

সেদিন শ্বেতাঙ্গ রমণী আমার নিকট যেভাবে যতখানি সম্মান পাইয়াছেন, নিগ্রো রমণীকেও ঠিক সেইভাবে ততখানি সম্মানই আমি দিয়াছি। হীন করিবার জন্য অথবা অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ রমণীর ভিতর আমি সম-ব্যবহার করি নাই। ধনী-দরিদ্র, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, সকল নারীকেই আমি সমান চক্ষে দেখিয়া তুল্য সম্মান দিয়া থাকি। কোনো শিশুই ইহাদের উভয়ের স্তন্য পান করিয়া কোনো পার্থক্য প্রমাণ করিতে পারিবেনা।

মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো-জননায়ক ফ্রেড্‌রিক ডগ্‌লাস্‌কে যেদিন নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে চা-পান করি, সেদিন তিনি খুবই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা জীবনভর দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা মনিবদের ছুঁৎমার্গ দেখিয়া দেখিয়া, এবং ইহারা যে পায়ের তলার চামড়া হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত সবখানিই অমানুষ কেনা-

গোলাম, এই কথা শুনিয়া শুনিয়া একেবারে আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

আমার সদ্ব্যবহারের ফলে একজন নিগ্রো বড় হয় নাই, বড় হইয়াছি আমি নিজে। নিগ্রোকে সম্মান করিয়া শ্বেতাঙ্গ জাতিই সম্মানভাজন হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিয়াও মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার আমেরিকা ভুলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেই আসিয়াছি। যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতির কর্ত্তব্য যে যমদণ্ডহস্তে নরপতিদের মতো রাজ্য-শাসনই নয়, আমি সর্ব্বপ্রকারে তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি।

নিগ্রোদের অটুট হৃদয়-বলের পরিচয় পাইয়াছিলাম, স্বাধীনতার জন্য তাহাদের মরণ-কামনা দেখিয়া। ইহাদের অন্ত-রাত্মা কেবল সুযোগ খুঁজিতেছিল। আমার বিশ্বাস, ভগবান সেই দুর্দ্দিনে ইহাদিগকে মুক্তির ভরসা দিয়াছিলেন। ইহারা ভোর হইতে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনিবের হুকুম তামিল করিত। তারপর, যার যার কুঠুরীর ভিতর যাইয়া নীরবে নীরবে নিশ্চয়ই ভগবানের নিকট ইহাদের অসহ্য ব্যথা অশ্রুজলে ভাসাইয়া পৌঁছাইয়া দিত। মানুষের মুক্তির জন্য ইহার চেয়ে বড় উপায় আর কি থাকিতে পারে! চল্লিশ লক্ষ নিগ্রোর অশ্রু একদিনে এক মুহূর্ত্তে যেদিন পড়িয়াছিল, সেইদিন বোধ হয় ভগবান নিজে আসিয়াই ইহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গের হাতে নিগ্রোর মতো আর কোনো জাতিই বোধ হয় এতদূর লাঞ্ছিত হয় নাই। এই নির্য্যাতন লাঞ্ছনার পরেও

যখন দেখিলাম, রিপাবলিকান সৈন্যদলে মৃত্যুভয়রহিত দুই লক্ষ নিগ্রো ভর্ত্তি হইয়াছে, তখনই আমার মনে হইয়াছিল, আর ভয় নাই। মৃত্যু যেখানে অমৃতের রূপে আদর পায়, সে সমাজ কখনো পড়িয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজে একজন বলিতে পারে "অভীঃ" সে সমাজে কোটী শক্তিমান রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই যুদ্ধে নিগ্রো-সমাজ দশ লক্ষ সৈন্য পাঠাইতে পারিত, এ বিশ্বাস আমার ছিল এবং আছে।

এই সকল সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ডেমোক্রাটদের হাতে বন্দী হইয়া উহাদের বিভিন্ন আড্ডায় নির্য্যাতিত হইয়াছিল। আমি সে বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, এই মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার জারী করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, "জাতিধর্ম্ম-শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে, যে কোনো প্রজাকে রক্ষা করা প্রত্যেক গবরমেণ্টের সাধারণ কর্ত্তব্য। জনসাধারণের কাজে যাহারা সৈন্যদলে যোগদান করে, বিশেষভাবে গবরমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য। আন্তর্জ্জাতিক আইন এবং সমর-নীতি অনুসারে প্রত্যেক বন্দীই সমব্যবহার পাইতে বাধ্য। শুধু বর্ণের তারতম্যের জন্য কোনো সৈন্যকে বিক্রয় করা অথবা গোলাম-খাটানো বর্ব্বরতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আন্তর্জ্জাতিক আইনের ইহা ঘোর বিরোধী এবং যুগ-সভ্যতার দিক হইতেও ভয়ানক অপরাধ-জনক। সেই জন্যই যুক্তরাষ্ট্র গবরমেণ্ট তাহার সকল সৈন্যকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কাজেই ঘোষণা করা যাইতেছে যে, যদি বিদ্রোহিগণ আমাদের কোনো সৈন্যকে বিক্রয় করে

অথবা দাসত্বে নিয়োগ করে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র গবরমেণ্টও তাহার বন্দী সৈন্যদের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন। যদি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বন্দী সৈনিককে সমরনীতি উপেক্ষা করিয়া হত্যা করা হয়, তাহা হইলে বিদ্রোহী সৈন্যকে ফাঁসি দিয়া তাহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে। যদি কোনো সৈন্যকে গোলামীতে খাটানো হয়, অথবা গোলামীর জন্য বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে বিদ্রোহী সৈন্যকেও হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীতে লাগানো হইবে। এবং যতক্ষণ না শত্রুপক্ষের সুবিবেচনার খবর পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহার খাটুনীর বিরাম হইবে না।" ইহার দ্বারা সুফল ফলিয়াছিল।

এক দাস-ব্যবসায়ীর ব্যবসার জন্যই পাঁচ বৎসর সশ্রম কারা-দণ্ড এবং তিন হাজার টাকা জরিমানা হয়। পাঁচ বৎসর জেল খাটিবার পর জরিমানার টাকাটা মকুফ চাহিয়া সে আমার নিকট এক আবেদন করে। আবেদনখানি বেশ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লেখা হইয়াছিল। আমি আসামীর উকীলের বক্তব্য শুনিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, দরখাস্তখানা বেশ করুণ ভাষায় লিখিত এবং আমার অন্তরেও বেশ লাগিয়াছে, তথাপি উপায় নাই। যদি সে একজনের একখানা হাত টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত, তাহা হইলেও আমি তাহাকে অনায়াসে ক্ষমা করিতে পারিতাম। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত সুদূর আফ্রিকায় গিয়া, তাহার বুক হইতে দস্যুর মতো তাহার পুত্র-কন্যাকে ছিনাইয়া আনিয়া, তাহাদের কপালে আজীবন গোলামী লিখিয়া

দিতে পারে, যে কর্ম্মের ভিতর কোনো মহান্ উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল শুধু সোনার টাকার লোভ, নরহত্যাকারীর চেয়েও ঘৃণিত এই ব্যক্তিকে আমি কোনোই ক্ষমা করিব না। যে পর্য্যন্ত কয়েদী মুক্তির জন্য কোনো নূতন আইন জারী না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে জেলে পঁচিয়া মরিতে দাও। আমার নিকট তার কোনো ক্ষমা নাই।"

আমি শত শত লোককে মৃত্যুদণ্ড হইতে মুক্তি দিয়াছি। কিন্তু দাস-ব্যবসায়ীরা কেন মুক্তি পাইবে, আমি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াও তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই নাই।

দাস-জাতির মুক্তির ঘোষণা-বাণী তখনো প্রচারিত হয় নাই। এমন সময়ে, একদিন একদল নিগ্রো সরকারী দপ্তরখানার নিকট ঘণ্টা দুই দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া, অবশেষে নিতান্ত ভয়ে ভয়ে অভ্যর্থনা আফিসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ভয়, পাছে কেহ কিছু বলে! আমি অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেই, মুখে একটা নূতন রকমের হাসি ফুটিয়া উঠিল, অথচ ছেলে-বুড়া সকলের চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আমিও চোখের জল রাখিতে পারি নাই। সেদিন তাহাদের হাসিকান্না দেখিয়া এবং ধন্যবাদ শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, স্বাধীনতা বস্তুটা ইহারা বেশ বুঝে। স্বাধীনতা হারাইলে মানুষ যথাসর্ব্বস্ব হারায়, আর যাহারা সে বস্তু হরণ করে, তাহারা যথাসর্ব্বস্বই হরণ করিয়া থাকে।

ফিলাডেলফিয়ার এক নিগ্রো বৃদ্ধা নানা রকম কারুকার্য্য

উপহার দিতে আসিয়া নানা কথার পর বলিলেন, "সেনাপতি, বহু বহু লোক আমাদের মুক্তির জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বিপক্ষের সোনারূপার লোভ সংবরণ তাহারা করিতে পারে নাই। বিপক্ষের বুলেট যদি আগে ছুটিত, তাহা হইলে তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু সোনারূপার এক এক ঢিলে ইহারা কাৎ হইয়া গেল। * * উদ্দেশ্যের প্রতি তোমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধার জন্যই ভগবান তোমার সহায়। শেষ পর্য্যন্ত সাহস ভরসা দিয়া, ভগবানই তোমাকে কূলে পৌঁছাইয়া দিবেন।" বৃদ্ধার চক্ষু তখন অশ্রুময়।

একদিন বাল্‌টিমোর হইতে তিন নিগ্রো ধর্ম্ম-প্রচারক এবং দুইজন বিশিষ্ট নিগ্রো-নাগরিক, সমুদয় নগরবাসীর প্রতিনিধি-কমিটি হিসাবে উপহার দিবার নিমিত্ত, খৃষ্টান ধর্ম্মের গীতা এক-খানি আনিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে নিগ্রো-জাতির স্বাধীনতালাভ হইবেই শুনিয়া, তাঁহারা পাঁচজনেই এক সঙ্গে আনন্দের কান্না কাঁদিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে যাহা বলিতেছিলেন, তাহার অর্থ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। অন্তরের রুদ্ধ-আবেগ অজস্র ধারায় ছুটিয়া আসিতেছিল। আমি সমুদয় নাগরিককে আমার প্রীতি-ভালোবাসা এবং রমণীদিগকে আমার শ্রদ্ধা জানাইতেই আবার সেই কান্না আরম্ভ হইল। ইহারা মানুষ হইয়া মানুষের কাছে দুর্ব্যবহার পাইয়া পাইয়া, নিজেদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ভুলিয়া গিয়া আজীবন এক নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ তাহাদের ভিতরের সহজাত গুণগুলির আবরণ খুলিয়া যাইতেই,

তাহারা হাসিয়া কাঁদিয়া তাহাদের সত্যকার পরিচয় দিল। তাহারা যে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল, আবার সেই হারানো মানিক ফিরিয়া পাইয়া, আনন্দে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। আমি সর্ব্বদা আমার কর্ত্তব্যই করিয়াছি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের অশ্রু দিয়া পবিত্রকরা উপহারের চেয়ে দামী আর কোনো উপহার সভাপতির জন্য থাকিতে পারে কি ?

অতঃপর ১৮৬২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর নিগ্রো-মুক্তির ঘোষণা-পত্র বাহির হয়—"১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্থানে ক্রীতদাস বলিয়া কেহ অভিহিত হইবে না,—সকলেই স্বাধীন। শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে কোনো প্রভেদ থাকিবে না।" * * সেদিন আমার অন্তরে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তা আমিই জানি। নিশ্চয়ই, সমুদয় নিগ্রোর অন্তরের আনন্দ কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। নিগ্রো-জাতির জীবন- প্রভাত দেখিয়া আমি যেরকম আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই পাই নাই।



১৬

তিন বৎসর পর ১৮৬৪ সালে আবার সভাপতি-নির্ব্বাচনের পালা আসিল। আবার সেই হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি, আবার সেই ভোটের জন্য ছুটাছুটি খোসামুদী আরম্ভ হইল। আমি আগের বারের মতো এবারেও একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। যদি দেশবাসী আমাকে না-চায়, তাহা হইলে নির্লজ্জের মতো দুয়ারে দুয়ারে বৃথা ছুটাছুটি করিয়া লাভ কি! বিশেষতঃ ঐ রকম ব্যাপারে আমি কোনোদিনই অভ্যস্ত নই। এমন সময়ে একদিন শোনা গেল, বাল্‌টিমোরের নৌ-বহরের নাবিক এবং সৈনিকরা একযোগে আমাকে চাহিয়াছে। বহু বহু ডেমোক্রাটও আমার নাম করিয়াছেন।

ইলেক্‌শনের মাস দুই পর আমার ইচ্ছা হইল, সৈন্যদলের জন্য আরো পাঁচ লক্ষ লোক ডাকা হউক। আমি মন্ত্রিসভায় আমার মত জানাইলাম। পদে পদে বাধা পাইয়া কাজ করা বড়ই বিপজ্জনক। কেহ বলিলেন, ইহাতে ভয়ানক বিপদ আসিবে, কেহ বলিলেন, তোমার নির্ব্বাচন লইয়া মহা গোল বাঁধিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিবাদ শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু নির্ব্বাচনের কথাটা শুনিয়া যারপর-নাই বিরক্ত হইলাম। নিগ্রোদের গোলামী-মনোভাবের

চেয়ে, ইহাদের গোলামী মনোভাবের বহরটাও কম ছিল না। ইহারা আজীবন দেখিয়া আসিয়াছে, যত মারামারি, ধাক্কাধাক্কি ঐ সভাপতির আসনটার জন্যই। ঐ আসনটাকে যে এককথায় ছাড়িয়া দিতে পারে, তেমন মানুষ ইহারা পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই, আর এখনো সে সংস্কার দূর করিতে পারে নাই। আমি বলিলাম, "আমার নির্ব্বাচনটাই কেন আপনারা এত বড় করিয়া দেখিতেছেন? কে সভাপতি হইবে, সেজন্য আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আজ আমাদের বড় প্রয়োজন কার্য্য উদ্ধার। আমার যে সকল বীর-পুত্রেরা লড়াই করিতেছে, তাহাদের সাহায্যের বন্দোবস্ত এবং দেশরক্ষা করা আগে দরকার। আমি যে লোক চাহিয়াছি, তাহার কমে এই যুদ্ধ কিছুতেই সত্বর শেষ করা যাইবেনা।" আমার বক্তব্য দেশময় আলোচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভোটের ফল বাহির হইয়া গেল। দেখিলাম, জনসাধারণ আমাকেই চায়। এই ব্যাপারে আমার একটা বড় রকমের আনন্দ হইল এই জন্য যে, দেশবাসীর উদ্দেশ্য আর আমার উদ্দেশ্য যে তফাৎ নয়, তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। জনসাধারণের উৎসাহ দেখিয়া মনে হইল, দশ লক্ষ লোক চাহিলেও তাহারা আপত্তি করিত না।

সপ্তাহ তিনেক পর যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম। ভার্জ্জিনিয়া, জর্জ্জিয়া প্রভৃতি গোলামীর পীঠস্থানগুলি ইতিপূর্ব্বেই দখল হইয়া গিয়াছিল। এইবারে রিপাবলিকান সৈন্যরা গোলামীর আর একটা প্রধান তীর্থ রীচ্মণ্ড্ দখল

করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। রীচ্মণ্ডে তিন দিন ভয়ানক লড়াই চলে। ডেমোক্রাটরা, একে-একে সকল স্থান হারাইয়া, এই রীচমণ্ডেই সকল শক্তি একত্র করিয়া শেষ রক্ষার চেষ্টায় ছিল। রিপাব্লিকানরাও এই শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তৃতীয় দিবস প্রভাতে দুই দলই অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিল। এই রকম যুদ্ধের বিবরণই ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। তৃতীয় দিবস বৈকালে রিপাব্লিকান্ সেনাপতি মিঃ গ্রাণ্ট ১২ হাজার সৈন্য বন্দী এবং ৫০টী কামান দখল করেন। চতুর্থ দিবস প্রভাতে রীচ্মণ্ডের পতন হয়।

সাধারণতঃ বিজয়ীপক্ষ কোনো অধিকৃত রাজ্যে যখন প্রবেশ করেন তখন মহা আড়ম্বর করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি রীচ্মণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলাম, দূরদেশী এক পথিকের মতো। ইহাতে অনেকেই দুঃখিত এবং বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমি যে মনোভাব লইয়া দাস-জাতির দাসত্বের কঠোর বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, ঠিক সেই মনোভাব লইয়াই রীচ্মণ্ডে প্রবেশ করিয়াছি। যে মাটির উপর ওয়াশিংটন, ইণ্ডিয়ানা এবং ইলিনয় অবস্থিত, সেই মাটির উপরই ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া এবং রীচ্মণ্ড অবস্থিত। আমি ওয়াশিংটনের জয়পতাকা রীচ্মণ্ডের বুকে উড়াইয়া, সেখানকার কীটপতঙ্গ-খড়কুটার প্রাণেও ব্যথা দিতে চাহি নাই। আমি চাহিয়াছিলাম, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার দূর করিয়া প্রীতি স্থাপন করিতে, গোলামী দূর করিয়া

স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, দরিদ্রের অন্তরে নব নব আশার বীজ বপন করিতে। রিপাবলিকান্ এবং ডেমোক্রাট আমার দুই হাত। আমি এক হাতের শক্তির মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য আর এক হাতকে কাটিয়া ফেলিতে চাহি নাই। রিপাব্-লিকান্ সৈন্যের জয়ধ্বনি ডেমোক্রাট-নারীর প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার করুক, এই ইচ্ছা আমি কোনোদিনই অন্তরে পোষণ করি নাই।

নিগ্রো-সমাজ মুক্তি লাভ করিল—আমার সাধনার সিদ্ধিও এইখানেই। দরিদ্র আমি, ইহার চেয়ে বড় সাধনা, বড় আকাঙ্ক্ষা, আমার আর কি থাকিতে পারে! একটা অবনত, নির্য্যাতিত সমাজের মুক্তি দিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসন লাভ করিয়াও আমি তত আনন্দ পাই নাই। সভাপতির পদ বাল্যে আমার এত কাম্য হইয়াছিল কেন জানিনা, কাহার ইচ্ছায় সেকথা আমার মুখ দিয়া সেদিন বাহির হইয়াছিল, তাহাও আমি জানিনা।—আমার ঐকথা শুনিয়া সেদিন কেহ আমাকে পাগল মনে করিত কিনা সেকথা অবশ্য শুনি নাই। তবে, যৌবনে যেদিন নিউ অরলিন্সে অফ্কাট মহাশয়ের নৌকায় বসিয়া নিগ্রোদের মাথায় চাবুক মারিতে দেখিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে এই সভাপতির পদ সত্যসত্যই আমার কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিগ্রো-সমাজের বেদনাই যে আমেরিকার অন্তরের সব চেয়ে বড় বেদনা, এই নিগ্রোজাতির মুক্তিতেই যে আমেরিকার

প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতা-লাভের প্রকৃত সম্মান,এই নিগ্রো-সমাজের মুক্তিতেই যে আমেরিকার আসল শক্তি বৃদ্ধি, তাহা আমি বহুকাল পূর্ব্বেই অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

ইণ্ডিয়ানার জঙ্গলের কাঠুরিয়া, মিসিসিপির মাঝি, মুদিখানার গোমস্তা-কর্ম্মচারী, বাড়ীর চাকর এবং ভাড়াটিয়া কশাই"আবে" লিঙ্কলন্‌কে সভাপতির পদের মোহ কখনো গ্রাস করিতে পারে নাই। আমার গন্তব্যস্থান ঠিক ছিল, কাজেই বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ-উপরোধ এবং ভোটের ভয় আমাকে কখনো হটাইতে পারে নাই। আমেরিকা তাহার অসহ্য বেদনা দূর করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, আমি নিমিত্তমাত্র হইয়া এই কার্য্য সাধন করিয়াছি। লক্ষ্য আমার স্থির ছিল, কাজেই কোনো মোহ, কোনো ভয়, কোনোদিন আমার অন্তরে স্থান পায় নাই। কোনো কামনার বন্ধন আমার ছিল না বলিয়াই, আমি কোনো সময়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই। বাল্যকাল হইতে নিজের চেষ্টায় নিজেকে মানুষ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল, ওয়াশিংটনে আসিয়া সেই অভ্যাসের বলেই নিজে সমুদয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছি। যে শক্তহাতে কুঠার ধরিয়া ইণ্ডিয়ানার জঙ্গল কাটিয়াছি, ঠিক সেই হাতেই আমেরিকার শাসনতন্ত্রের লাগাম ধরিয়া আমার প্রাণপ্রতিম অসংখ্য সৈন্যের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া দিয়াছি।

দরিদ্র আমি, জীবন-যাত্রার প্রারম্ভে সম্পদের এককণা

সাহায্য কখনো পাই নাই। ইণ্ডিয়ানার এবং ইলিনয়ের কুটিরে যেভাবে জীবন কাটাইয়াছিলাম, ওয়াশিংটনের রাজপ্রাসাদে আসিয়াও তাহার কোনোই পরিবর্ত্তন দেখি নাই। ডেমোক্রাটরা দেশের কি ক্ষতি করিয়াছিল তাহা আপনারা জানেন। কিন্তু আমি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়াছিলাম। অসংখ্য সৈন্য, অপরিমিত অর্থ, অফুরন্ত অস্ত্র-শস্ত্র এবং অটুট নৌ-বহর সৃষ্টি করিয়া আজ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া দিয়াছি। আমেরিকার গবরমেণ্ট সুদৃঢ় হইয়াছে, আর কেহ ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে না। এই কার্য্যের ভিতর আমার কৃতিত্ব বিশেষ কিছুই নাই। আমি দেশবাসীর কাজে নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছিলাম, সেই বিশ্বাসেই তাহারা তাহাদের অকপট ভালোবাসা এবং অকৃত্রিম স্বদেশভক্তি আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। আমি তাহাদের স্বদেশভক্তি এবং ভালোবাসাকে অস্ত্ররূপে, সঙ্গীরূপে এবং সহায়রূপে পাইয়াই, নিগ্রোজাতির মুক্তিযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি।

আমেরিকার স্বাধীনতালাভের ৮৭ বৎসর পর, নিগ্রোজাতির স্বাধীনতালাভে আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে শক্তি এবং মর্য্যাদা লাভ করিল। পরবর্ত্তী ৮৭ বৎসরের ভিতর শ্বেতাঙ্গজাতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই গোলামের জাতি নিগ্রো-সমাজ আমেরিকার মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিবে, আমার বিশ্বাস। কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো সমাজ মনুষ্যত্ব এবং শক্তিহীন নহে, কাজেই তাহার দান লইবার জন্য জগৎ প্রার্থী হইয়া রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জগতে

অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবে। আশা করি, এই নিগ্রোজাতি সেদিন কি কর্ম্মে, কি চিন্তায় সর্ব্বত্রই তাহাকে মিশাইয়া দিতে পারিবে। জগতের সেই নব যুগের নূতন অধ্যায়ে মানবজাতির মঙ্গল, দরিদ্রের উত্থান, পরাধীন জাতির দুর্ব্বল-স্কন্ধে স্বাধীনতার জয়-পতাকা-বহন, সর্ব্বোপরি মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য, মৃত্যুর পরেও আমি অপেক্ষা করিব।

জগতের উন্নতির জন্য আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই আমরা আসিয়া থাকি, এবং প্রয়োজন সাধিত হইলেই সরিয়া পড়ি। যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন আর বৃথা গণ্ডগোল সৃষ্টি করার কোনো আবশ্যক করে না। এ পর্য্যন্ত আমাকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া বহু বেনামী চিঠি আমার নিকট পাঠানো হইয়াছে। বহু কেন, একখানা চিঠিতেই আমি বিষয়ের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিতে পারিতাম।

আমার বুকে গুলী করিলে যদি আমেরিকার, দুঃখীর, এবং নির্য্যাতিতের কোনো উপকার হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বদাই আমার জামার বোতাম খুলিয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের অসমাপ্ত কার্য্য এবারের মতো যতটুকু করিবার ভার পাইয়াছিলাম, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন আমি যে কোনো মুহূর্ত্তে সরিয়া পড়িতে প্রস্তুত। কিন্তু দেশবাসীর হাতে মৃত্যু—বড়ই করুণ!

আমার মায়ের সরল প্রাণে, পবিত্র চিত্তে, আমার মৃত্যুর যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। আমার বিদায়ের কালে তাঁহার যে অশ্রু পড়িতেছিল, পুত্রের সভাপতির পদলাভে, কি নিগ্রো-জাতির মুক্তির আনন্দে এক

মুহূর্ত্তও তাহা রুদ্ধ হয় নাই। আমার মৃত্যুতে বন্ধু বান্ধব অনেকেই হয়ত শোক করিবেন, অশ্রু ফেলিবেন, কিন্তু সন্তানহারা জননীর মতো আমার মা, তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত আমার শোকে পাগল হইয়া থাকিবেন। অপরিচিত আমাকে বুকে তুলিয়া লইয়া যে সরল সহজ ভাবের করুণ অভিনয় করিয়া গেলেন, তাহা এ জগতের নয়। নিঃস্বার্থতার মূর্ত্তি জীবনে এমনটী আর কোথাও দেখিলাম না!

আজ, ইণ্ডিয়ানার এবং ইলিনয়ের জঙ্গলে জঙ্গলে, মিসিসিপি এবং সান্‌গামোনের তরঙ্গে তরঙ্গে, ওয়াশিংটনের রাজপ্রাসাদে এবং কেন্‌টাকীর শুক্‌না মাঠে, বাল্‌টিমোর এবং ফিলাডেলফিয়ার নিগ্রো পল্লীতে পল্লীতে, ভার্জ্জিনিয়া, জর্জ্জিয়া এবং রীচমণ্ডে এক হাসি এক আনন্দ দেখিতেছি। দরিদ্রের আশা, নির্য্যাতিতের হাসি, পরাধীনের আনন্দ, আজ সকল বাধা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহার চেয়ে বড় আনন্দ মানুষ আর কি আশা করিতে পারে?

আমার সৈনিক ও নাবিক পুত্র এবং আমেরিকার নারীদের জীবন মধুময় হউক। তাঁহাদের মনুষ্যত্ব আমেরিকার গৌরব বাড়াইয়া তুলুক। নিগ্রোজাতি মানুষ হইয়া জগতের হিতসাধন করুক। আমেরিকা শক্তি ও শান্তিলাভ করুক। ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।

সমাপ্ত